সম্পাদকীয়

নোয়াখালী সদর উপজেলার গর্বিত সন্তান প্রিন্সিপাল আশরাফুল করিম এডভোকেট বহু গুণের অধিকারী। তিনি একাধারে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক, সাংবাদিক, লেখক, আইনজীবি এবং সংগঠক। তিনি মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। চরবাটা সৈকত কলেজের সাবেক প্রিন্সিপাল। অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক নোয়াখালী বার্তা ও মাসিক নোয়াখালী দর্পণের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। তিনি নোয়াখালীর আরেক ধনাঢ্য শিল্পপতি, বাংলাদেশ বিকল্প ধারার বর্তমান মহাসচিব মেজর মান্নান সাহেবের প্রতিষ্ঠিত মেজর মান্নান ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। জনাব আশরাফুল করিম নোয়াখালীতে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্বশালী শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক। তিনি কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের এসএসসিতে বাণিজ্য বিভাগের মেধা তালিকায় নোয়াখালী জিলা স্কুল থেকে ১১তম স্থান এবং চট্টগ্রাম গভমেন্ট কমার্স কলেজ থেকে এইচএসসিতে বাণিজ্য বিভাগের মেধা তালিকায় ২য় স্থান অর্জন করেছিলেন।

প্রিন্সিপাল আশরাফুল করিম এডভোকেট সুদূর সাউথ আফ্রিকায় দীর্ঘ এক যুগের অধিক সময় ধরে পরিবার নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তিনি ২০১২ সালে শুরুর দিকে বাংলাদেশে আসেন। সাউথ আফ্রিকা মহাদেশ থেকে দেশে এসে আমাদের খোঁজ খবর নেয়ায় আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছি। তিনি দীর্ঘ প্রবাসে থেকে জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা এবং বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের বহুল কাহিনী আমাদের সাপ্তাহিক চলতিধারা পত্রিকায় প্রেরণ করেন। তার জীবনে ঘটে যাওয়া নানা কাহিনী পড়ে আমাদের খুব ভাল লেগেছে। আগামী দিনে নতুন প্রজন্মদের জন্য তার জীবনের এই নানা অভিজ্ঞতা কাজে আসবে বলে বিশ্বাস করে তার কিছু লেখা ও সাক্ষাৎকার নিয়ে একটি বিশেষ সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি।

অবশেষে মাইজদী পাবলিক কলেজ সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ ও প্রতিবেদন নিয়ে তথ্যবহুল বিশেষ সংকলনটি প্রকাশ করছি। অতি অল্প সময়ে সংকলনটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা সত্যিই গর্ববোধ করেছি। আশা করি তার সংকলনটি পড়ে পাঠক ও নতুন প্রজন্ম তৃপ্তি পাবেন এবং মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারবেন। তার সংকলনটি পড়ে আগামীতে সমাজের কল্যাণে নিবেদিত আরেকজন আশরাফুল করিম তৈরি করার মানসিকতা আপনাদের মাঝে তৈরি হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শিক্ষাবিদ আশরাফুল করিমকে নিয়ে লিখতে গেলেএই ছোট পরিসরের সম্পাদকীয় পাতা শেষ হবে না। তিনি শিক্ষায় যেমন উন্নত, চিন্তায় ও উন্নত এবং মানুষের কল্যাণে ও নিবেদিত। তিনি বাস্তবতা ও খালেছ নিয়তকে জীবনের মহান ব্রত মনে করেন। তিনি একজন ত্যাগি ও কর্মঠ মানুষ। মাইজদী পাবলিক কলেজের ইতিহাসসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রকাশিত সংকলনে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। প্রকাশিত সংকলনটি পড়ে সবাই উপকৃত হবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বিদেশে থেকেও তিনি বাংলাদেশে তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাংখী ও কলা কৌশলীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। যা আজকের যুগে বিরলই বলা যায়। বিদেশে থেকে দেশের ভাল মন্দ নিয়ে সকলের সাথে নিয়মিত যোগাযোগই প্রমাণ করে তিনি একজন প্রকৃত দেশ প্রেমিক মানুষ। দেশবাসীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেই তিনি ক্ষ্যান্ত থাকেননি, সাউথ আফ্রিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশীদের নানা সমস্যা নিয়েও মাথা ঘামান বলে আমরা জানতে পেরেছি। সম্প্রতি তিনি মাসিক বাংলাদেশ পোষ্ট নামে সাউথ আফ্রিকা থেকে প্রথম বাংলায় প্রকাশিত পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনা শুরু করেন। এছাড়া সাউথ আফ্রিকায় একটি বেসরকারী টেকনিক্যাল কলেজের সাথে জড়িত হয়েছেন এবং ইউনিভার্সিটি অব বোতসোয়ানা থেকে এমএড ডিগ্রি কোর্স সম্পন্ন করেছেন।

আজকের আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সমাজে প্রিন্সিপাল আশরাফুল করিমের মত মানুষ সংখ্যা নগণ্য। সমাজ বিনির্মাণে ও মানবতার কল্যাণে জনাব আশরাফ নিজের হালাল আয়ের অর্থে নানামুখী সমাজ কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রবাস জীবনে থেকে সমাজের অন্ধকার জায়গাগুলোতে আলো দিতে তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তি উদ্যোগে এলাকায় শত শত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান-অনুদান দিয়ে আসছেন। এই সমস্ত কর্মকান্ডগুলো শুনা নয় বাস্তবে দেখা। দেখা থেকেই আমরা তার কিছু অংশ সম্পাদকীয়তে লিখেছি। জনাব আশরাফের মত একজন উচ্চমানের শিক্ষাবিদের উপর ক্ষুদ্র পরিসরে সাপ্তাহিক চলতিধারায় একটি বিশেষ সংকলন প্রকাশ করতে পেরে মনে হচ্ছে আমরা যোগ্যতার প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছি। আমরা তার জীবনের সাফল্য কামনা করি।

////////////////////////////

একান্ত সাক্ষাৎকার

বর্তমানে অনুদান দিয়ে নিজ নামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করার সামর্থ থাকলেও মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়ে হিংসা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কারণে এখন আর ইচ্ছে করে না

------প্রিন্সিপাল আশরাফুল করিম এডভোকেট, প্রতিষ্ঠাতা, মাইজদী পাবলিক কলেজ, বর্তমানে সাউথ আফ্রিকা প্রবাসী

মাইজদী পাবলিক কলেজকে নোয়াখালীতে প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ উন্নীত করার ইচ্ছা ও সম্ভাবনা কতিপয় ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারীর হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার কারণে বাস্তবায়ন করা যায়নি। বর্তমানে অনুদান দিয়ে নিজ নামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করার সামর্থ থাকলেও মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়ে হিংসা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কারণে এখন আর ইচ্ছে করে না।

সাউথ আফ্রিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত নোয়াখালীর কৃতি সন্তান, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক প্রিন্সিপাল আশরাফুল করিম এডভোকেট বলেছেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাইজদী পাবলিক কলেজকে নোয়াখালীতে প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত করার ইচ্ছা ও সম্ভাবনা কতিপয় ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারীর হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার কারণে বাস্তবায়ন করতে পারেননি। তবে চরবাটা সৈকত কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করার পর নোয়াখালী শহরে মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং অবৈতনিক প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্বীকৃতি লাভ এবং শিক্ষক কর্মচারীদের সরকারী এমপিওভুক্তির সময়ে স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক নেতা ও কলেজের অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কারণে অবৈধ ও বিধিবহির্ভূত উপায়ে কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে সাময়িক বরখাস্তের পর তিনি দেশ ত্যাগ করে এমএড ডিগ্রী লাভের জন্য আফ্রিকার বোতসোয়ানায় চলে যান। বর্তমানে তিনি পার্শ্ববর্তী দেশ সাউথ আফ্রিকায় প্রবাসী। জনাব আশরাফ আক্ষেপ করে বলেন, তাঁর দ্বারা নিয়োগকৃত শিক্ষক কর্মচারীদের মীরজাফরী ও বেঈমানীর ভূমিকায় তিনি হতভম্ব হন এবং কলেজ প্রতিষ্ঠার সকল অবদান ও কার্যক্রম পন্ডশ্রমে পরিণত হয়। তাঁর কলেজ থেকে সরে যাবার পর বিগত প্রায় ১৫ বছরেও তেমন কোনরূপ উন্নতি ও উন্নয়ন না হবার কারণে তিনি খুব দুঃখ পান। বিদেশে বসেও তিনি কলেজের খোঁজ খবর নেন। কিন্তু কলেজ থেকে কোনরূপ সাড়া তিনি পাননি। এখন প্রয়োজনীয় অনুদান দিয়ে নিজ নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার সামর্থ থাকলেও অতীতের অভিজ্ঞতা ও ঘটনায় তিনি সাহস পাননা বলে জানান। কারণ, যে কোন উদ্যোগের পেছনে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ভয় পান।

জনাব আশরাফ ইউনিভার্সিটি অব বোতসোয়ানায় ডিপার্টমেন্ট অব এডাল্ট এডুকেশন থেকে এমএড কোর্স সম্পন্ন করেন। প্রবাসী বাংলাদেশীসহ বিভিন্ন দেশের ও স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজনে একটি কনসালটেন্সী ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তিনি সাউথ আফ্রিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত। দেশের এই বর্তমান অবস্থায় দেশে থাকার ইচ্ছা দিন দিন কমে যাচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তবে তিনি দেশের প্রতি বিশেষ করে নোয়াখালীর উন্নয়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সুদূর প্রবাস থেকে আশরাফুল করিম বৃত্তি প্রদানসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় অনুদান ও সাহায্য অব্যাহত রেখেছেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখালেখি করেন।

জনাব আশরাফের প্রবাস থেকে নিয়মিত পাঠানো বিভিন্ন লেখা এবং তাঁর মাইজদী পাবলিক কলেজ সম্পর্কিত প্রকাশিত সাম্প্রতিক লেখাগুলোর সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ হিসেবে চলতিধারা বিশেষ সংখ্যা বের হচ্ছে। এ সংখ্যায় বিশেষ কিছু লেখা প্রকাশিত হলো। লেখাগুলো সম্পর্কে যে কোন সংশোধন ও মন্তব্য আহ্বান করছি।

মাসিক নোয়াখালী দর্পণ নামক ম্যাগাজিন ও সাপ্তাহিক নোয়াখালী বার্তা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন জনাব মুহাম্মদ আশরাফুল করিম এডভোকেট। তিনি চরবাটা সৈকত কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ, মেজর মান্নান ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিম করিমপুর জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, জমিদারহাট

উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির (১৯৯৫-৯৭) দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

জনাব আশরাফ ঢাকা আইনজীবি সমিতির আজীবন সদস্য ও নোয়াখালী জেলা আইনজীবি সমিতির সদস্য, ঢাকা ট্যাক্সেস বার এসোসিয়েশনের লাইফ মেম্বার ও নোয়াখালী ট্যাক্সবার এসোসিয়েশনের সদস্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ল'ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য এবং ঢাকাস্থ বৃহত্তর নোয়াখালী আইনজীবি কল্যাণ সমিতি ও বাংলাদেশ আইন উন্নয়ন সংস্থার ডোনারসহ বহু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত।

জনাব আশরাফুল করিম এডভোকেট মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি আফ্রিকা মহাদেশের বোতসোয়ানায় গমন করেন এবং সাউথ আফ্রিকায় প্রবাসে লেখাপড়া ও ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত। তিনি সেখানে কোম্পানী ল', বিজনেস ও মার্কেটিং কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন। সম্প্রতি তিনি ডিপ্লোমা ইন ইমিগ্রেশন ল' সম্পন্ন করেন। তিনি লন্ডন, সৌদি আরব, আবুধাবী, ভারত, নেপাল, দুবাই, জিম্বাবুয়ে, সোয়াজিল্যান্ড, জাম্বিয়া, মোজাম্বিক, নামিবিয়া ও কাতার প্রভৃতি দেশ সফর করেন।

সম্প্রতি জনাব আশরাফ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় বেশ কিছু অনুদান প্রদান করেছেন বলে জানান। তন্মধ্যে জমিদারহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে বিশ হাজার টাকা, পশ্চিম করিমপুর ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় দুই লক্ষ টাকা, নন্দনপুর জামে মসজিদে বিশ হাজার টাকা, আকরাম মেমোরিয়াল মাদ্রাসা ও মসজিদে দশ হাজার টাকা, নোয়াখালী প্রি-ক্যাডেট স্কুলে এক লক্ষ টাকা উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যতে আরও অনুদান প্রদানে ইচ্ছুক। তিনি গরীব, আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসীকে আরো প্রায় বিশ লাখ টাকার আর্থিক সাহায্য ও অনুদান দেন বলে জানান। তিনি বিভিন্ন পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ভবিষ্যতে জনসেবা, সমাজ কল্যাণ ও এলাকার উন্নয়নে তিনি ভূমিকা ও অবদান রাখার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। তবে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ভয় পান বলে জানিয়েছেন।

//////////////////////////

চরবাটা সৈকত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালনের কারণে জনাব আশরাফের মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন সহজ হয়েছে

জনাব আশরাফ ঢাকায় মীরপুর মর্ডাণ কলেজ বেসরকারী ইসলামী ক্যাডেট কলেজ ইসলামী একাডেমী, ঢাকা নাইট কলেজ ও রাজধানী নাইট কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের সাথে জড়িত ছিলেন। কিন্তু সেসব কলেজ শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। অতঃপর নোয়াখালীর চরজব্বার কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল হবার অনুরোধের পর শেষ পর্যন্ত সেখানে প্রিন্সিপাল না হওয়া এবং চরবাটায় সৈকত কলেজের শুরুতে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করার অনুরোধ পান। মূলতঃ চরবাটা সৈকত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করার পর মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রতিষ্ঠা ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন সহজ ও সম্ভব হয়েছে।

জনাব আশরাফ ১৯৯২ সালে ঢাকা নাইট কলেজ এবং মীরপুর মর্ডাণ কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে না পেরে নোয়াখালীর চরাঞ্চলে একটা নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার জন্য অবৈতনকি প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করতে রাজী হন। প্রথম দিকে চরজব্বর এলাকায় নেতৃস্থানীয় কিছু ব্যক্তির প্রস্তাব আসে সেখানে একটি নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। তিনি তাদেরকে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগান। তারা তাকে প্রিন্সিপাল হবার এবং কলেজটির অনুমোদন নিয়ে দেবার অনুরোধ করেন। কিন্তু কলেজের জমিদাতা ও এক লাখ টাকার অনুদান ঘোষণাকারী প্রতিষ্ঠাতার বন্ধুকে প্রিন্সিপাল করার কারণে তাঁকে এসিসটেন্ট প্রিন্সিপাল হতে অনুরোধ করা হয়। যদিও এরকম কোন পদ সরকারীভাবে ছিলনা, তাই তিনি রাজী হননি। তিনি সদ্য এল এল বি পাশ করা যুবক নোয়াখালী বা ঢাকার জজ কোর্টে ওকালতি করার চিন্তা-ভাবনা করেন। ১৯৯৩ সালে চরজব্বারে কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে চরবাটায় অরেকটা কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। একটা কমিটি করে কিছু চাঁদা/অনুদান তোলা হয়। কিন্তু তখন আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজ চালু করা বা অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করতে কাউকে পাওয়া যায়নি। চরজব্বার কলেজে প্রিন্সিপাল হতে না পারা বা প্রথমদিকে জনাব আশরাফের নাম প্রিন্সিপাল

হিসেবে প্রচারিত হওয়ায় চরবাটার কিছু লোক মাইজদী শহরে তাঁর সাথে যোগাযোগ শুরু করে। ১৯৮২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেসরকারী স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা জরিপে দায়িত্ব পালন এবং শিক্ষা বিভাগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ও শিক্ষক শিক্ষিকার তদ্বীরের কারনে চর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রধান ও শিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ তাঁর ভক্ত ও অনুরাগী ছিলেন। তখন প্রিন্সিপাল পদে পাবার জন্য তাদের আগ্রহ ও উদ্যোগ ছিল বেশী। আর চর এলাকার উন্নয়নে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ও অবদান ছিল। সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মরহুম মাকসুদ আহমেদ সাহেবের সাথে বিশেষ (দাদা নাতীর) সম্পর্ক ছিল। তিনি তখন চরবাটার অধিবাসী। বিভিন্ন সময় উপজেলার চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাহেবদের সাথে চরের বিভিন্ন এলাকায় সফরকারী জনাব আশরাফকে চরবাটার সন্তান এডভোকেট এবিএম জাকারিয়া সাহেবের চেম্বারে সহযোগী হিসেবে ওকালতি করার জন্য সাইন বোর্ডে নাম লেখান। উনিও চরবাটা কলেজের অধ্যক্ষের পদে যোগ দেয়ার জন্য বলেন। সোনাপুর কলেজের অধ্যাপক মরহুম মিজানুর রহমান (উনার বাবার সাথে পরিচয় ও সম্পর্ক থাকার কারণে)। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও স্বজন ছিলেন। একদিন তিনি ও এলাকার এক এম কম পরীক্ষার্থী (বর্তমানে সৈকত কলেজের অধ্যাপক) জসিম উদ্দিন একটা মোটর সাইকেল নিয়েই তার কাছে আসেন এবং এলাকার চেয়ারম্যান পরে কলেজের অধ্যক্ষ জনাব খায়রুল আনম সেলিমের অনুরোধ জানান। তাঁরা ঐদিনই চরবাটায় যান সরাসরি চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ী।

জনাব আশরাফ দরখাস্ত করে বা ইন্টারভিউ দিয়ে অধ্যক্ষ হননি বা দায়িত্বভার গ্রহণ করেননি। কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরুতে কমিটির রেজুলেশনে তিনি বিনা বেতনে কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন এবং কার্যক্রম শুরু করেন ওকালতি সনদের পরিপন্থী ও বে আইনী বলে বেতনভুক্ত কর্মচারী হতে চাননি। শুধুমাত্র অধ্যক্ষ হবার ইচ্ছা ও নামের সাথে প্রিন্সিপাল পদবীর ব্যবহার করার সুযোগ লাভের জন্য তখন যাতায়াতের অসুবিধা ও অনুন্নত চরাঞ্চল এবং চরজব্বারে সাথে প্রতিযোগিতা সত্বেও তিনি চরবাটায় সৈকত কলেজ প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিও অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অল্প সময়ে কলেজের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেও ছাত্রছাত্রী ভর্তির কাজ ও শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগসহ বোর্ডের স্বীকৃত লাভের চেষ্টা সাধনা করেন, যা চরবাটার স্কুল ও মাদ্রাসার প্রধান ও শিক্ষক কর্মচারীগণ ভাল বলতে পারবেন। তৈরি কলেজ পরিচালনা ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন যত সহজ নতুন ও কলেজ শুরুর সময় কার্যক্রম ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন তত কঠিন। বিশেষ করে চরজব্বার কলেজের পাশাপাশি চরবাটায় আরেকটা নতুন কলেজ চালু ও স্বীকৃতি পাওয়া দুস্কর ছিল। চরবাটা সৈকত কলেজের প্রতিষ্ঠার শুরুতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির পোষ্টার ও হ্যান্ডবিলে অধ্যক্ষ হিসেব জনাব আশরাফের নাম ছাপা হবার পর এবং পত্রপত্রিকায় কিছু সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় শহরে ব্যাপক আলাপ আলোচনার শুরু হয়। তৎকালিন এমপি সাহেব চরজব্বার কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এতে সরকারী দলের সমর্থন ও স্থানীয় প্রশাসনের বেশ সহযোগিতা ছিল। ঐ সময় ঢাকায় অবসরপ্রাপ্ত ডিজি ড. এইচ এম করিম সাহেবের সাথে দেখা হলে তিনি তার আমলে শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে চরবাটা হাই স্কুলের জন্য বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্পে দশ লাখ টাকা মঞ্জুরী বরাদ্দ করতে বলেছিলেন, আর সেখানে পরে কলেজ করে অধ্যক্ষ হলেন বলে মন্তব্য করেন। চরবাটার চেয়ারম্যান (কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বর্তমানে সুবর্ণচর উপজেলা চেয়ারম্যান, জনাব খায়রুল আনম সেলিম ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা। এতে বিরোধী দলের মত চরবাটা কলেজ ভোগান্তির শিকার হয়। তবুও জনাব আশরাফ অধ্যক্ষ হিসেবে তার ব্যালেন্স করতে চেষ্টা করেন এবং সফল হন। যেমন-এমপি সাহেব চরজব্বার কলেজের সভাপতি হন এবং সৈকত কলেজের সভাপতি হতে অনীহা প্রকাশ করেন বিধায় সদর থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি মনোনয়ন করা হয়। বোর্ডে চরজব্বার কলেজের অনুমোদন ও স্বীকৃতির দরখাস্তে এমপি সাহেবের সুপারিশ বা ভূমিকা ছিল। আর সৈকত কলেজ স্বীকৃতি দরখাস্তে তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী মেজর (অব:) আবদুল মান্নানের সুপারিশ ও প্রভাব ছিল। এমপি সাহেব চরজব্বার কলেজ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন আর সৈকত কলেজ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় তৎকালীন মন্ত্রী জনাব কর্ণেল আলী আহমদ দ্বারা। এমপি সাহেবকেও সৈকত কলেজে আমন্ত্রণ জানানো হয় ও সংবর্ধনা দেয়া হয়। মোটকথা সৈকত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে সরকারী দলের এমপি ও মন্ত্রী মহোদয়গণসহ বিএনপির স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা নেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে এডভোকেট এবিএম জাকারিয়ার ভূমিকাও ছিল। সৈকত কলেজের শুরুতে অধ্যক্ষ হিসেবে জনাব আশরাফ ছাড়া কোন শিক্ষক তখন পর্যন্ত নিয়োগ লাভ করেননি। একজন অফিস সহকারী, একজন পিয়ন, একজন নৈশ প্রহরী ও একজন ক্লিনার ছিল। তিনি চরবাটা হাইস্কুল সংলগ্ন একটা রুমে থাকার বাসস্থান এবং সাইক্লোন সেন্টারে একটি রুমে অফিস স্থাপন করে কলেজের কার্যক্রম শুরু করেন তারপর ২/৩ জন শিক্ষক কলেজের কার্যক্রমে যোগ দেয়া শুরু করেন। শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভের জন্য কিছু দরখাস্ত এবং কমিটির মাধ্যমে ইন্টারভিউ নেয়ার পর তাদেরকে নিয়োগপত্র (অস্থায়ীভাবে) প্রদান করে কাজে যোগদান করার অনুরোধ করেন এবং ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রচেষ্টা চালান। তারপর ক্লাশ শুরু হয়। শহর থেকে আসা শিক্ষকবৃন্দের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর নেতৃত্বে বা পরিচালনায় কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন

হতে থাকে। ঐ বছর কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে চর এলাকাসহ নোয়াখালীর বিভিন্ন এলাকায় তাঁর নাম ব্যাপকহারে প্রচারিত হয়। সেটাই তাঁর কাল হয়ে দাঁড়ায়।

নোয়াখালী শহরের কিছু প্রাক্তন অধ্যক্ষ বা অধ্যাপক কিংবা অবসরপ্রাপ্তরা তাকে প্রিন্সিপাল বলতে নারাজ বা পরশ্রীকাতর হয়ে পড়েন। কিছু সাংবাদিক সহ্য করতে পারেনি, যদি ও তিনি একজন সম্পাদক ও সাংবাদিক ছিলেন। তারা তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার বা কুৎসা রটনার অপচেষ্টা চালান, সাথে কিছু রাজনৈতিক নেতা ও টাউট শ্রেণীর লোক যোগ দেন। তাঁর সাথে আওয়ামী লীগ নেতা সেলিম সাহেবের সম্পর্ক নষ্ট করারও অপপ্রচেষ্টা চালানো হয়। তিনি বিনা বেতনে ও কম খরচে থাকা খাওয়াসহ শুধুমাত্র কলেজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা ও অবদান রাখার মানসে সাময়িকভাবে কলেজের অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করতে রাজী ছিলেন। তাই হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার শিকার হলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত সফল হয়নি। তিনি একক ও স্বাধীন চিত্তে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। কোন সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রমে সেলিম চেয়ারম্যান সাহেব বাধা দেননি বা তার সাথে কোন মনমালিন্য হয়নি। আর কমিটির সদস্যবৃন্দ ছিলেন দারুণ খুশী। সাধারণ জনগণ ছিলেন মুগ্ধ। কারণ মাত্র অল্প দিনের মধ্যে চরজব্বার কলেজের চেয়ে ভাল ও উন্নত একটা কলেজ চালু ও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জনাব আশরাফ কলেজ প্রতিষ্ঠার পর চলে আসার কথা বলেছিলেন।

চরবাটা এলাকা তখনও এত উন্নত ছিলনা। খবরের কাগজ পাওয়া যেতো না। রেডিও টেলিভিশন ছিল সংবাদের জন্য। শহর থেকে যাতায়াতের রাস্তাও পাকা ছিলনা বরং ভাঙ্গা রাস্তা ছিল ও মুরির টিন বাসে যাতায়াত করতে হতো। কত কষ্টকর ছিল তা বলা মুশকিল। মনে উঠলে এখনও গা শিওরে উঠে। তবুও তিনি কলেজ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনে বছর খানেক ছিলেন। কিন্তু মন ছিল ঢাকা বা মাইজদী শহরে। ঐ সময় চরবাটায় বিয়ের প্রস্তাব এবং বাড়ি ঘর করার অনুরোধ আসে, অনেকেই জমি কেনার জন্য বলে। স্থায়ীভাবে থাকার কথা উঠে। কিন্তু তিনি তো স্থায়ীভাবে চরে থাকতে যাননি। চরবাটা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোস্তফা সাহেব আজীবন প্রধান শিক্ষক এবং এম এ পাশ করেই এলাকার চেয়ারম্যান সেলিম সাহেবের আর শহরে যাওয়া বা থাকা বা বড় কিছু হওয়া হয়ে উঠেনি। স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। জনাব আশরাফ সে ধরনের কিছু যেন না হয় সেজন্য চরবাটা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। বড় ধরনের কোন কান্ড বা কেলেংকারীর ভয়ও ছিল। ১৯৯৪ সালে ঢাকায় বার কাউন্সিলের একটি প্রশিক্ষণে যান। তখন ঢাকায় বন্ধু/বান্ধব সহপাঠীদের কাছ থেকে চরের প্রিন্সিপাল খেতাব পান ও নানা বিদ্রুপ সহ্য করে। মাইজদী শহরের অনেকেই ওকালতি করতে বলেন। অবশেষে মাইজদী থেকে চরবাটায় একটা পদত্যাগ পত্র পাঠান এবং থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (সভাপতি হিসেবে) একটা সভা আহ্বান করে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। পরে শহরে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন কিন্তু সৈকত কলেজের অকৃতজ্ঞ শিক্ষক কর্মচারী বা স্থানীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ ও এলাকাবাসী তাঁকে অধ্যক্ষ হিসেবে একটা বিদায় সংবর্ধনাও দেয়ার কথা চিন্তা করেনি বা ভাবেনি। সেটাই তাঁর দুঃখ থাকলো। তবে চরবাটা সৈকত কলেজের কারণেই প্রিন্সিপাল হবার শখ পূরণ এবং মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে। যার ফলে তা করতে সফল হয়েছেন। তা না হলে কলেজের প্রিন্সিপাল ও প্রতিষ্ঠাতা হতেন না, চরবাটা সৈকত কলেজের প্রথম বছর তো বিনা বেতনে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করার সময়। কিন্তু আমাদের দেশের ও জাতির দুর্ভগ্যের মত হয়তো কলেজের অধ্যক্ষের তালিকায় তাঁর নামও নেই। বিনা বেতনে কাজ করার নজির বা উদাহরণ তাঁর মত কেউ দিতে পারবেন না। তাঁর তো দরখাস্ত করে বা ইন্টারভিউ দিয়ে চরবাটা সৈকত কলেজের অধ্যক্ষের চাকুরী করা হয়নি। বরং অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে চরবাটা সৈকত কলেজের অভিজ্ঞতায় শহরে মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠা ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন জনাব আশরাফ।

//////////////////////

মাইজদী পাবলিক কলেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কারণে জনাব আশরাফের দেশ ত্যাগ ও প্রবাসে প্রতিষ্ঠা লাভের কাহিনী

জনাব আশরাফের দেশ ত্যাগের নেপথ্য কাহিনী লেখার প্রয়োজন অনুভব করিনি। কিন্তু দেশে বিভিন্ন লোকের প্রশ্ন এবং দেশের নতুন প্রজন্মের অনেকের জিজ্ঞাসা বা জানার আগ্রহে আজ তা লিখতে বসলাম। ছাত্র জীবনের সময় থেকে যারা তাঁকে চিনে ও জানে তারা তাই প্রবাসের জীবন সম্পর্কে বেশ কৌতুহলী এবং উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেশ উৎসাহী।

দেশে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালীন সময়ে ভবিষ্যত জীবনের লক্ষ সম্পর্কে একেক সময়ে একেক বিষয়ে ভাবনায় আসতো। ছাত্র জীবন শেষে কাংখিত কর্ম জীবন না পাওয়ায় কিংবা টাকা-পয়সা রোজগার করতে না পারার কারণে জীবন সম্পর্কে হতাশাও মাঝে মাঝে দেখা দিতো। তবুও দেশ ত্যাগ করে বিদেশে যাবার কথা মাথায় আসেনি। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার জন্য যে বিদেশে যাবার আগ্রহ বা উদ্যোগ ছিল, তা বলাই বাহুল্য তাই বিদেশে এম এড কোর্স করার সুযোগ ও লোভ সংবরণ করতে পারেননি। যদিও দেশ ত্যাগের পেছনে আরও কারণ ছিল। আর সেটা ছিল মাইজদী পাবলিক কলেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত। জনাব আশরাফের যৌবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করে সম্পূর্ণ একক উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, সরকারী জমির ব্যবস্থা, মাটি ভরাট ও গৃহ নির্মাণের জন্য তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এক লক্ষ টাকার অনুদানের ব্যবস্থা করার জন্য তৎকালিন স্থানীয় সাংসদ জনাব মো: শাহাজাহানের সহযোগিতা ও ভূমিকা ছিল। তৎকালীন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেজর (অব:) আবদুল মান্নানের সুপারিশ বিভিন্ন দরখাস্তে ছিল। কলেজের ভবন নির্মাণের জন্য বিশিষ্ট শিল্পপতি ব্যবসায়ী জনাব সিরাজুল ইসলামের এক লক্ষ টাকার অনুদান, কলেজের প্রথম সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি হিসেবে জনাব আনোয়ার মির্জার নগদ এককালীন ১০ হাজার টাকার অনুদান ও কলেজের গৃহ নির্মাণে ৩০/৪০ হাজার টাকার টিন ক্রয় করে দেয়া এবং হাতে গোনা কিছু লোকের সাহায্য সহযোগিতা কলেজটি করতে উৎসাহী করে। তৎকালীন শিক্ষা অফিসার আলহাজ্ব মো: মাহফুজুর রহমান ও তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব মশিউর রহমানের ভূমিকা ও অবদান ছিল প্রশসনীয়। কলেজ প্রতিষ্ঠার পরই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত শুরু হয়। কলেজটি করতে ব্যক্তিগত আয় রোজগার, কষ্ট ও পরিশ্রম, অবৈতনিক প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন, ওকালতি চেম্বারের চেয়ার টেবিল অধ্যক্ষের অফিসে ব্যবহার, থাকার ঘরেই অধ্যক্ষের কার্যালয় স্থাপন, নিজের সমস্ত চিন্তা ভাবনা ও সময় কলেজের পেছনে ব্যয় করা, নিজের ব্যক্তিগত পরিচিতি ও কর্মকান্ড দ্বারা কলেজকে প্রতিষ্ঠা করা এবং কলেজের সরকারী অনুমোদন লাভ করাসহ যাবতীয় ভূমিকা ও অবদান জনাব আশরাফের একক ও ব্যক্তিগত ছিল। কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম ২/৩ বছরে কোন চাঁদার রশিদ ছাপা হয়নি। কেউ ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুদান প্রদান করেননি। প্রায় ২ বছর পর অনুদান পাওয়া যায়। শুরুতে বিচারপতি মরহুম বদরুল হায়দার চৌধুরী কর্তৃক চেশায়ার ফাউন্ডেশন থেকে কিছু আসবাবপত্র পাওয়া যায়। নোয়াখালী পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান মরহুম রবিউল হোসেন কচি প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয়ে পোষ্টার ও হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে দিয়েছেন। হামর্দদ কর্তৃক এবং বায়তুশ সাইফ দরবার শরীফ থেকে কিছু বৈদ্যুতিক ফ্যান দেয়া হয়। আরও কিছু আসবাবপত্র এবং বাকী ও ঋণ পাওয়া গিয়েছিলো তখন।

জনাব আশরাফের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অবৈতনিক অধ্যক্ষ পদ থেকে সরানোর জন্য ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত শুরু হয়। কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে নানা বেনামী দরখাস্তসহ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মোকাবিলা করতে হয়েছে। অবশেষে তাঁর দ্বারা নিয়োগকৃত এবং তাঁর হাতে পায়ে ধরে কিংবা বিশেষ অনুরোধে চাকুরী পাওয়া শিক্ষক কর্মচারীদেরকে স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক নেতা ও কুচক্রীমহল হাত করে। তাদেরকে দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কলেজের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক বরাবরে কলেজের কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাত এবং সুন্দরী মহিলা প্রভাষিকাদেরকে যৌন হয়রানীর অভিযোগ আনা হয়। তৎকালীন জেলা প্রশাসককে রাজনৈতিক ও স্থানীয় কুচক্রীমহল হাত করে নেয়। তাঁকে কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে সাসপেন্ড করে। কলেজ অধ্যক্ষের কার্যালয়ের তালা চাবি পরিবর্তন করে তা দখল করা হয়। দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে লজ্জায় ও রাগে তিনি কলেজে না যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আদালতের আশ্রয় নেন। সেই সময় জানমালের নিরাপত্তার অভাব পর্যন্ত দেখা দেয়। ধৈর্যের সাথে সেটা সহ্য করেন। ঐ কলেজটি প্রতিষ্ঠা করতে নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মোকাবিলা করতে সক্ষম হলেও তার বিরুদ্ধে আনা ঐ সব অভিযোগ তার মনোবল ও কাজের স্পৃহা নষ্ট করে দেয়। তিনি কলেজের ব্যাপারে সকল আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। অকৃতজ্ঞ ও বেইমান শিক্ষক কর্মচারীদের মীরজাফরী ও কর্মাকান্ড খুব ব্যথিত করে। ওকালতির সনদ থাকায় কোর্টে যাওয়া আসা করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কলেজের জন্য মায়া ও নিষ্ঠুর বিদায় পীড়া দিতে শুরু করে। প্রায় ৩ বছরের সাধনা বৃথা হয়ে পড়ে। এক সময়ের তাঁর দ্বারা চাকুরী পাওয়া শিক্ষক কর্মচারীদের আচরণ ও ব্যবহার আরও ব্যথিত করে। তিনি প্রবাসী একজনকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন এবং বিয়ে করেন। স্ত্রীর তখনকার ব্যাংকেই কয়েক লক্ষ টাকা জমা ছিল। বাবার বাড়িতে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। শ্বশুর বাড়ির সুনাম ও পরিচিতির দরকার নেই। শহরের সবাই চেনার কথা। স্ত্রীর সুবাদে ও কারণে শেষ পর্যন্ত বিদেশে যাবার সিদ্ধান্ত নেন।

বিয়ের পর বিদেশের ভিসা পেতে এক বছর লেগে যায়। সেই সময় প্রায়ই বেকার ছিলেন। কোন কাজে মন বসাতে পারেননি তবে ও সময়ের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সমূহ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। জনাব আশরাফের দেশে থাকা অবস্থায়ই কলেজে শিক্ষক কর্মচারীদের সাথে কলেজ কমিটি তথা জেলা প্রশাসকের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আনীত তথাকথিত হাস্যকর অর্থ আত্মসাতের ও সুন্দরী প্রভাষিকাদের যৌন হয়রানীর অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ঐ সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের যৌন হয়রানীর কাহিনী পত্র-পত্রিকায় বেশ প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত সুন্দরী প্রভাষিকাদের যৌন হয়রানীর মত জঘন্য ও আপত্তিকর অভিযোগ আনা হয়। তিনি

অবিবাহিত থাকায় সেটা মুখরোচক হয়ে পড়ে। ঐ সব সুন্দরী প্রভাষিকাদের স্বামী বা পিতা কিভাবে সেটা সমর্থন করেছে বা তাঁর বিরুদ্ধে তাদের মেয়ে বা স্ত্রীকে লেলিয়ে দিয়েছে তা মাথায় ধরেনি। তবুও তা ধৈর্যের সাথে হজম করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে দরখাস্ত লেখা বা রেজুলেশন লেখায় তখনকার একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা ছিল। ঐ অধ্যক্ষের কর্মজীবন ও শেষ জীবন তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষায় রেজুলেশন লিখে দিয়েছেন। জনাব আশরাফের দেশে থাকা অবস্থায় ঐ কলেজটির তেমন উন্নতি বা উন্নয়ন দেখে যেতে পারেননি। প্রায় এক বছরেরই মাথায় কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের নিয়োগ বৈধকরণে সময় জেলা প্রশাসক দ্বারা নিয়োজিত শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ কমিটি কর্তৃক প্রায় সকল শিক্ষকই অযোগ্য বিবেচিত হয়। প্রায় সকলের নিয়োগ না হওয়ার সুপারিশ দেখেই সবাই হতভম্ব হয়ে পড়ে। তারা কলেজ কমিটির সভাপতি পদে জেলা প্রশাসাকের পরিবর্তে তৎকালীন মাননীয় সংসদ সদস্যকে মনোনয়ন করে তাদের নিয়োগ বৈধকরণ করে নেয়। এতে তাদের চাকুরী লাভ হয় কিন্তু কলেজটির কোন উন্নতি হয়নি। মীরজাফরের মত একজন প্রভাষক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে। পরে তার পরিণতি মীরজাফরের মতই হয়েছে। সে সাউথ আফ্রিকায় দেশ থেকে পালিয়ে এসে হকারী করে এবং সেখানে বিয়ে করে টিআরপি করে থাকে। তার গত পনের বছরেও কোন উন্নতি হয়নি। সে তখন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হলেও ৬ মাস পর তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠে। আর জনাব আশরাফ সাউথ আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত এক প্রবাসী উচ্চ শিক্ষা ও ডিগ্রি প্রত্যাশী এবং বর্তমানে দেশে ১৫ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়ে নিজ নামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে সামর্থ্য। এসব আল্লাহর দান ও ইশারা, সামনে আরও প্রতিষ্ঠা লাভ ও টাকা রোজগারের জন্য সকলের দোয়া চান। ভবিষ্যতে হয়তো আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।

বেঈমান মীরজাফরের পরিণতি সম্পর্কে অনেকে হয়তো অবগত আছেন। আমাদের ইতিহাসে বাংলার শেষ নবাব সিরাজদৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার নজির স্থাপন করেছিল মীরজাফর গং। আর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারী এবং বিশ্বাসঘাতকদের পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। শুনেছি মীরজাফর প্রথমে নবাব পদ হারান এবং পরে কুষ্ঠ রোগে মারা যান। আর মীরন বজ্রপাতে, মেহেদী বেগ ঘাতকের হাতে ভবলিলা সাঙ্গ করেছে। জগতশেঠ, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফসহ ৯ জন নৌকাডুবিতে, ক্লাইভ আত্মহত্যা করে, উর্মিচাঁদ পাগল হয়ে মারা গেছে। মাইজদী পাবলিক কলেজ এবং জনাব আশরাফের বিরুদ্ধে হিংসা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারী এবং বিশ্বাসঘাতকদের অনেকেরই পরিণতি ও পরাজয় ঘটেছে এবং ঘটবে। সেটা ভবিষ্যতে পরবর্তীতে আরেক লেখায় বা বক্তব্যে প্রকাশ করবো।

অর্থনৈতিক ও পারিবারিক প্রয়োজনে দেশ ত্যাগ ও বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে তিনি প্রচুর কষ্ট ও পরিশ্রম করতে করতে শেষ পর্যন্ত টাকা পয়সার মুখ দেখেন। এখনও অবৈধ ও হারাম আয় রোজগার থেকে দূরে থেকে সততা, ন্যায় পরায়ণতা, কষ্ট ও পরিশ্রমের বিনিময়ে আজ বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। দেশে থাকা অবস্থায় নাম, সুনাম ও পরিচিতেতে অর্থের আগমন ঘটেনি। সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত থাকা অবস্থাতে ও কোন ব্ল্যাক মেইলিং বা চাঁদা নেওয়ার মত কাজকে খারাপ মনে করতেন। কলেজ প্রতিষ্ঠা ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের সময় বাহবা বা তোষামদ লাভ করলেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলেজ থেকে তাঁর দ্বারা নিয়োগকৃত বা তাঁর হাতে পায়ে ধরে চাকুরী পাওয়া ঐ সব শিক্ষক কর্মচারীদের আচরণ ও ব্যবহার এখন ও মনে হলে শিহরে উঠেন। এত বড় জঘন্য কাজ তারা কিভাবে করছে তা ও মাথায় ধরে না। তাঁর দেশ ত্যাগের বিরাট কারণ সেটা তো কেউ বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তবে তা ১০০% সত্য। দেশ ত্যাগ করে আজ তিনি প্রবাসে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। জনাব আশরাফের দেশ ত্যাগের পূর্বে কলেজ কমিটির তৎকালিন সভাপতি ও জেলা প্রশাসক সাহেবের বোধদয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা প্রামাণিত হওয়ায় আবার কলেজের অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালনের প্রস্তাব পান। যদিও ওকালতি করতে হলে কলেজের চাকুরী রাখা আইনগত সমস্যা থাকায় সব সময় অবৈতনিক অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং সেই সময়েও তা করতে রাজী ছিলেন। তাছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা অভিযোগ, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জবাব দিতে পুনরায় অধ্যক্ষ পদে বহাল হবার চিন্তা করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেলা প্রশাসক সাহেবের কলেজ কমিটির সভাপতি পদ হারানোর পর তা আর সম্ভব হলো না। তৎকালীন এম পি সাহেব কলেজ কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব ভার গ্রহণের শুরুতে কলেজে প্রত্যাবর্তনের কথা উঠলেও তিনি বিদেশে যাবার ভিসা পাবার পর তার জন্য আর আগ্রহ দেখাননি। বিষয়টি অমিমাংসিত রেখেই দেশ ত্যাগ করেন। এখন মাখে মাখে সে সব স্মৃতি মনে পড়ে। আদালতে মামলা ছিল কিন্তু পরে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। জনাব আশরাফের কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে সাসপেন্ড করেই স্থানীয় রাজনৈতিক কিছু নেতা, ষড়যন্ত্রকারী ও চক্রান্তকারী এবং নেমক হারাম কিছু ভদ্র লোক তাঁর বিশেষ ক্ষতি সাধন করার অপপ্রচেষ্টা চালায়। দুর্নীতি দমন বিভাগে তাঁর নামে সরকারী জমি আত্মসাত, (যা কলেজের নামে বরাদ্দের জন্য আবেদন করেছিলেন)। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের এক লক্ষ টাকার অনুদান আত্মসাত এবং কলেজের মাটি ভরাটের জন্য বরাদ্দকৃত কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পেম গম কেলেংকারীতে জড়ানোর অপপ্রচেষ্টা চলে। তাঁর ঐ সব অভিযোগের জবাব যথাযথভাবে দুর্নীতি দমন বিভাগে দিতে সক্ষম হন। তবে যারা এসবের পেছনে কলকাটি নাড়াছাড়া

করেছেন বা বিরোধিতা ও ক্ষতি সাধন করতে চেয়েছেন, তাদের অনেকেরই দেশে থাকার সময়ে এবং পরে বিদেশে এসে করুন পরিণতির কথা শুনেছেন। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারীরা সব সময়েই পরাজয় বরণ করতে বাধ্য।

জমিদার হাট উচ্চ বিদ্যালয়কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এমপি সাহেবের সুপারিশে বিশ হাজার টাকার চেক অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক পরবর্তীতে সরকার পরিবর্তনের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে স্কুলের লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের কাল্পনিক অভিযোগ আনে। অথচ তাঁর আমলেই স্কুলের সভাপতি হিসেবে প্রচুর উন্নয়ন হয়। শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে এমপি সাহেব সহ তাঁর বিরুদ্ধে বিশ হাজার টাকা আত্মসাতের মিথ্যা মামলা দায়ের করে। সাথে সাথে ঐ প্রধান শিক্ষকের ইন্দনে ও অপপ্রচেষ্টার স্থানীয় পশ্চিম করিমপুর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের পাঁচ হাজার টাকার অনুদান আত্মসাতের অভিযোগে এমপি সাহেব এবং সভাপতি হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন বিভাগ আরেকটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে। এমপি সাহেব নাকি হাইকোর্ট থেকে ঐ সব মামলায় আগাম জামিন নেন।

জনাব আশরাফ দেশে থাকলেও তা পেতেন। ঐ সব মিথ্যা মামলা সরকার পরিবর্তনের পর ডাষ্টবিনে যাবার কথা। রাজনৈতিক হয়রানীর জন্য ঐ সব মিথ্যা মামলা দুর্নীতি দমন বিভাগ কেন করেছে দেশে থাকলে তার বিরুদ্ধে পাল্টা মানহানির মামলা করার উদ্যোগ নিতেন। কারণ দেশে থাকা অবস্থায় ঐ অনুদানের হিসাব ও খরচের ভাউচার সহ প্রতিবেদ জমা দিয়ে গিয়েছিলেন। বিদেশে চলে যাবর কারণে পরবর্তীতে দুর্নীতি দমন বিভাগের মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে আইনগত লড়াই করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ঐ মামলা সমূহের নেপথ্য নায়ক সেই প্রধান শিক্ষককে চাকুরীচ্যুত এবং সামাজিকভাবে খুব হেনাস্থা হতে হয়েছে।। সেটা তার কৃতকর্মের ফল ছিল। জনাব আশরাফ দেশে থাকা অবস্থায় নানান ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের পর হিংসা বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার শিকার হয়ে দেশ ত্যাগ এবং বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভের পেছনে মেধা পরিশ্রম ও বুদ্ধির দ্বারা কাজ ও মানুষের উপকার ছিল অন্যতম কয়েকটা কারণ। কিন্তু বিদেশে যেমন দিন দিন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বাড়ি কিনেছেন ও টাকা পয়সার মালিক হতে শুরু করেছেন। তখন দেশী কায়দায় বা দেশের মত প্রবাসী কিছু বাঙ্গালীর হিংসা বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার শিকার হচ্ছেন। নানান ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মোকাবিলা করেছেন। প্রথমে ২/৩ বছর প্রচুর কষ্ট পরিশ্রম করেছেন। এখন সুখে শান্তিতে থাকলেও মাঝে মাঝে কিছু বাঙ্গালীর কারণে টেনশনে থাকতে হয়। ওরা কিছু করতে না পারলেও সাময়িক সমস্যা ও অসুবিধা দেখা দেয়। কিন্তু সত্যের জয় মিথ্যার ক্ষয় হতে বাধ্য। আল্লাহ তাঁর সাথে আছেন। কিছুই করতে পারবেনা ইনশা আল্লাহ। তিনি সৎ পথে ও হালাল রুজির পথে আছেন।

বিদেশে তাঁর সহর্ধমিনী স্ত্রীর প্রচেষ্টা ও কাজ করার প্রতি আগ্রহ প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করেছে। তার অনুপ্রেরণার ও সহযোগিতায় আজকে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দেশের কথা প্রায়ই মনে পড়ে। দেশে যেতে সাহস করেন না। দেশে গেলে যদি আবার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের শিকার হই। সেই ভয় মাঝে মাঝে মনে আসে। তাই বিদেশে যাবার পর বেশ কয়েক বছর দেশে আসা হয়নি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলেঝের জন্য মন কাঁদে, শিক্ষক কর্মচারীদের অকৃতজ্ঞতা ও বেঈমানীর জন্য কলেজকে তো দায়ী করা যায় না। কলেজের উন্নতি ও উন্নয়ন কামনা ছাড়া বিদেশে বসে কিছুই করতে পারছেন না। তাঁর দেশ ত্যাগটা যদি সুন্দরভাবে হতো তাহলে আজ কলেজের একজন বড় অভিভাবক বা ডোনার হতে পারতেন। কারণ তাঁর হাতে গড়া কলেজকে তো শিক্ষক কর্মচারীদের উপর রাগ করে ধ্বংস হতে দেয়া যায় না। এখন তাঁর তো আর দেশে থাকার সম্ভাবনাই কম। বিদেশের আয় রোজগার থেকে কলেজের উন্নয়নে অনুদান পাঠাতে পারতেন। সেই আফসোস ও দুঃখে প্রবাসে দিন কাটাচ্ছেন।

বোতসোয়ানায় জনাব আশরাফ যে কাজ বা ব্যবসা করেন সেটা কোন বাঙ্গালী করে না বা পারে নাই। এর আগেও কোন বাঙ্গালী করে নাই। ভবিষ্যতেও কোন বাঙ্গালী পারবে কিনা সন্দেহ আছে। তাঁর যে সুযোগ বা লাইন জানা তাতে ভিসা দিয়ে দেশ তেখে লোক এনে জনপ্রতি কম পক্ষে এক লক্ষ টাকা করে এক বছরেই বাংলাদেশী কোটি কোটি টাকা রোজগার করতে পারেন। কিন্তু সে আয় বা রোজগারকে হালাল মনে করেননা। সেটা যারা করে তারা সুখে নেই। মানুষের দোয়া ও অভিশাপ বড় বলে তার বিশ্বাস। মানুষকে প্রলোভন দেয়া ও কষ্ট দেয়া তাঁর নীতির বিরুদ্ধে। তাই ঐ ধরনের আয় রোজগার থেকে দূরে থাকেন এবং দূরে থাকাই কাম্য। বোতসোয়ানায় তাঁর যে অফিস বা ব্যবসা তাতে বেশীর ভাগ সময় বাহিরে থাকতে হয়। আর এম এড ডিগ্রির জন্য ক্লাশ ও লেখাপড়া তো থাকে। তাঁর অফিস ও ব্যবসা তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী দেখাশুনা করতেন। এই অফিসে বা ব্যবসায়ে কাউকে শেয়ার করা ও নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি অবশ্য দরকার হয়নি কারো। অধিকাংশ কাজই তাঁর মাথা থেকে বুদ্ধি দ্বারা হয়েছে। এই ব্যবসায়ে আয় রোজগারের কোন সীমা ছিল না। যেমন ওকালতি ও ডাক্তারী পেশা যারা করেন তাদের আয় রোজগারের মত। এতে কেউ অনেক টাকা পয়সার মালিক হতে পারেন। এ ব্যবসায়েও অবশ্য আয় রোজগার কম নয়।

২০০৮ সালে বোতসোয়ানা ছেড়ে পাশ্ববর্তী দেশ সাউথ আফ্রিকায় চলে আসে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকা জন্য ৫ বছরের ওয়ার্ক পারমিট করেছেন। বোতসোয়ানার মত আর সাউথ আফ্রিকায় মানুষের কাজ করতে চাননা। সেজন্য একটা

কোম্পানীতে পার্টনারশীপের মত ইনভেষ্টমেন্ট করে বিভিন্ন ব্যবসা করার চিন্তায় ও চেষ্টায় আছেন। মাইজদী পাবলিক কলেজের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কারণে দেশ ত্যাগ ঘটেছে। প্রবাসে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন সেটাই আসল কথা। বর্তমানে তিনি সাউথ আফ্রিকার পারমানেন্ট রেসিডেন্স পারমিট এবং নন সিটিজেন আইডি হোল্ডার।
////////////////////////////////

জনাব আশরাফ কেন মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

জনাব আশরাফ কেন মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটা অনেকেই প্রশ্ন ও জানার আগ্রই দেখে এ লেখায় হাত দিলাম। কিভাবে মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বা এককভাবে কলেজের প্রতিষ্ঠার ব্যয়ভার কেন ও কিভাবে বহন করেছে বা মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত ইতিহাস ইতিপূর্বে বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। তাই সেই সম্পর্কে এ লেখায় কিছু লিখলাম না। তবে মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠা কারণ বা প্রতিষ্ঠাতা হবার ইচ্ছা সম্পর্কে কিছু লিখবো।

১৯৮২ সনে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরীপে দায়িত্ব পালন এবং পরে নোখায়ালী দর্পণ ও নোয়াখালী বার্তা পত্রিকা প্রকাশনা ও সম্পাদনা, ঢাকাস্থ নোয়াখালী জেলা সমিতি ও সুধারাম উপজেলা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার সর্বোপরি শিক্ষামন্ত্রণালয় শিক্ষা ভবন, শিক্ষা বোর্ড ও জেলা শিক্ষা অফিসে যাতায়াত ও যোগাযোগ থাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার কাহিনী ও বর্ণনা শোনা ও জানা হয়। যেমন- সোনাপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ফজলে এলাহী, বাধেরহাট আবদুল মালেক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম স্পীকার আবদুল মালেক উকিল, কবিরহাট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম দেলওয়ার হোসেন ইঞ্জিনিয়ার উল্লেখযোগ্য। উক্ত তিনটি কলেজের জরীপ কাজ সম্পন্ন এবং প্রতিষ্ঠাতাদের সম্পর্কে জেনে তাতে একটা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হবার ইচ্ছা জাগে। অবশেষে মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হয়ে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। তবে বয়স কম থাকায় এবং রাজনৈতিক কারণে সে অবদান ও ভূমিকা কিছুটা ব্যাহত হয়। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি মর্যাদা পাননি। তখন জনাব আশরাফের বয়স কম থাকলেও শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার ব্যাপারে তেমন কোন বির্তক বা আপত্তি ছিলনা। ব্যক্তিগত হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার শিকার কিছু রাজনৈতিক নেতার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কারণে কলেজের প্রতিষ্ঠা কাজে নানারূপ বাধা বিপত্তির কবলে পড়েন অতঃপর দেশ ত্যাগ করে প্রবাসী হন, দেশে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ছিলেন না, কিন্তু পেশাগতভাবে এডভোকেট ও আয়কর উপদেষ্টা এবং প্রিন্সিপাল ও সাংবাদিক ছিলেন। পরে প্রবাসে উচ্চ শিক্ষা লাভ এবং আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বর্তমানে নিজের নামে ব্যক্তিগত অনুদান দিয়ে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে সামর্থ যদিও আল্লাহ দিয়েছেন কিন্তু ভবিষ্যতে আবার যেন কোন ষড়যন্ত ও চক্রান্তে পড়েন সেজন্য সাহস হয় না।

জনাব আশরাফের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মাইজদী পাবলিক কলেজে যদি বিদায় বা দেশ ত্যাগ করে প্রবাসী হওয়া সুন্দরভাবে হতো তাহলে আজ তাঁর ব্যক্তিগত অনুদান ও ভূমিকায় কলেজটির এখন বহু উন্নতি ও উন্নয়ন হতো। তাঁর অবর্তমানে কলেজের তেমন উন্নয়ন হয়নি। অথচ প্রায় ১৫ চলে গেছে, কলেজের ছাত্রছাত্রী ভর্তি এবং পাশের হার ও তেমন সন্তোষজনক নয়। অনেকেই তাঁর কোন অভিশাপ থাকতে পারে বলে মনে করেন। সেটা আল্লাহ ভাল জানেন। তবে প্রতিষ্ঠাতার কোন অবমূল্যায়ন করে কোন প্রতিষ্ঠান ভাল হতে পারে না বা উন্নতি হয়নি। মাইজদী পাবলিক কলেজ সেটার একটা বড় উদাহারণ, সেটা তো অনেকেই মনে করেন বা একটা বিরাট সত্য। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া জরুরী প্রয়োজন।

জেলার অন্যান্য কলেজের মত এলাকার বা এলাকাবাসীর কোন উদ্যোগ ভূমিকা তেমন নেই মাইজদী পাবলিক কলেজের ভাগ্যে। কারণ এলাকাবাসীর চাঁদায় বা উদ্যোগ কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এলাকাভিত্তিক কোন সাহায্য বা সহানুভুতি কলেজটি পায়নি। রাজনৈতিকভাবে ও কোন উদ্যোগ বা ভূমিকা ছিল না। জনাব আশরাফ কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না বা অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু তার সাথে তখন সরকারী দলের মন্ত্রী ও এমপিদের যোগযোগ, সম্পর্ক পরিচিতি ও যাতায়াত ছিল কলেজের স্বার্থে। কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সেটা জরুরী ছিল। আর্থিক সামর্থ থাকলে সেটার দরকার হতো না। কিন্তু পরবর্তীতে সরকার পরিবর্তনের কারণে রাজনৈতিকভাবে যারা ভাল জানতেন না, তারা খুব উঠে পড়ে লাগেন তাঁর বিরুদ্ধে। যেই রাজনৈতিক দলের লোক মনে করে তাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবহার করা হয়, সে

রাজনৈতিক দলের তথা বিরোধী দলের এমপি সাহেব জেলা প্রশাসককে বাদ দিয়ে কলেজের সভাপতি হলেও কোন উপকারে আসেননি বা তাঁকে সমর্থন করেননি ।

যাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে তাঁকে কলেজ ত্যাগ করে তথা দেশ ত্যাগ করে প্রবাসী হতে বাধ্য করেছে, তাদের জন্য এখন দোয়া করতে হয় । কারণ, এদের কারণেই আজ আর্থিকভাবে তিনি সুপতিষ্ঠিত । অথচ দেশে তার বিনা বেতনের অধ্যক্ষ ছিলেন বিনা কিসের উকিল ছিলেন । সাংবাদিকতা পেশা ছিল না বলে আয় রোজগার তেমন ছিলনা, দেশে থাকলে এত টাকা-পয়সার মালিক সহজে হতে পারতেন না, সেজন্য তাঁর বিরোধিতাকারীদের উপর এখন আর তেমন ক্ষোভ বা দুঃখ নেই । আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত করুন । তাদের কারণে তিনি এখন ব্যক্তিগত জীবনে আর্থিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নিজ নামে কলেজ করতে সক্ষম ।

জনাব আশরাফ দশ বছর প্রবাসে থাকার পর ২০০৮ সালে ডিসেম্বর মাসে নোয়াখালী ছিলেন । তখন প্রায় মাইজদী পাবলিক কলেজ বন্ধ ছিল । কিন্তু শিক্ষক কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতেন, বেতন-ভাতা উত্তোলন করতে হয়েছে । ৪/৫ জন শিক্ষক কর্মচারীর সাথে দেখা সাক্ষাৎ বা মোবাইলে কথা হয়েছে । জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনে কলেজটির প্রতি কোন ভাল ধারনা বা মন্তব্য দেখেননি, সকলেই তার প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের কথা স্মরণ করছেন এই কলেজের উপর ক্ষোভ ও রাগ প্রকাশ করেছেন, স্থানীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মাইজদী পাবলিক কলেজের টিনের ঘরের ও তাঁর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ছবিসহ সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে । কলেজের টিনের ঘরের ছবির সাথে তাঁর ছবি দেখে খুব খারাপ লেগেছে । অথচ তাঁর দ্বারা কলেজটির উন্নয়ন ও উন্নতি সম্ভব ছিল । কিন্তু কেউ তাঁর কাছে তা চায়নি বা বলেনি । সেজন্য কিছু করতে পারেননি ।

এই প্রসঙ্গে কলেজে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের ভূমিকা দেখে হতাশ হয়েছেন । তাঁরা শুধু কলেজের চাকুরী ও বেতনটাই পেয়েছেন । কলেজের কোন উন্নয়ন ও উন্নতি করতে পারেননি । তাঁর হাতে পায়ে ধরে চাকুরীতে নিয়োগ লাভ করে পরে তাঁর সাথে বেঈমানী ও মীরজাফরের মত ভূমিকা পালন করেছেন । এবার তাদের সুযোগ ছিল তাঁর সাথে যোগাযোগ করে তাদের কৃতকর্ম বা পাপের কিছুটা লাঘব করা ও কলেজের ভবিষ্যত উন্নয়ন ও উন্নতির চিন্তা করা, তাঁর তো এখন আর অধ্যক্ষের চাকুরীর প্রয়োজন নেই বা বেতন দিতে বা নিতে হবে না, আল্লাহ তাঁকে মাইজদী পাবলিক কলেজের উন্নয়নে ব্যক্তিগত অনুদান দেয়ার সামর্থ ও সুযোগ দিয়েছেন । কিন্তু তারা সেটা চায়নি । তাই মাইজদী পাবলিক কলেজের জন্য কোন অনুদান দিতে পারেননি জনাব আশরাফ ।

////////////////

জনাব আশরাফ এককভাবেই মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রতিষ্ঠার শুরুর বছরে সকল ব্যয়ভার বহন করেন

জনাব আশরাফ কিভাবে মাইজদী পাবলিক কলেজ করেছেন বা তখন তাঁর আয়ের উৎস কি ছিল কিংবা টাকার ব্যবস্থা কিভাবে করেছিলেন, সে সম্পর্কে অনেকেরই কিছু প্রশ্ন বা জানার বিষয়ে আজ এ লেখায় হাত দিলাম । শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন কিছু চাঁদা ও অনুদানের উপর নির্ভর করে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে । কিন্তু তিনি চাঁদা বা অনুদানের উপর নির্ভর না করে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন । তিনি চরবাটায় সৈকত কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় অবৈতনিকভাবে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছিলেন । ইতিপূর্বে চরজব্বার কলেজের প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকেও তাঁর নাম প্রথমে অধ্যক্ষ হিসেবে প্রচারিত হয়েছিলো । কিন্তু সেখানে তাঁর যোগদান বা দায়িত্ব পালন করা হয়নি । ২৮ বছর বয়সে প্রিন্সিপাল হন তিনি ।

নোয়াখালী সদর উপজেলার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরীপের (স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা) দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা শিক্ষক কর্মচারীদের বহু উপকার করা এবং বিনা টাকায় কাজ করার কারণে অনেকেই তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন । পরবর্তীতে তাঁদের অনেকেই তাঁকে দেখলে আপ্যায়ন বা বিভিন্ন ব্যাপারে সহযোগিতা করতে চাইতেন । তখন তাঁর টাকা-পয়সার খুব চাহিদা ছিলনা । বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষক কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ও কাজে শিক্ষক কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ও কাজে শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরে তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতার বিনিময়ে যে হাত খরচ পাওয়া যেতো সেটার পুরো অংশই মাইজদী পাবলিক কলেজের পেছনে ব্যয় করেছেন । তাছাড়া কলেজের ব্যয় যত সম্ভব কম করার চেষ্টা থাকায় তখন তেমন অসুবিধা ও সমস্যা হয়নি । আর শিক্ষাবোড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কলেজের খরচাদি খুব কম হতো বা বিনা টাকায় কাজ হতো । কারণ তিনি সে সবখানে সুপরিচিত ছিলেন ।

মাইজদী পাবলিক কলেজ হবে কিনা বা করতে পারবেন কিনা, সে ব্যাপারে অনেকেরই তখন সন্দেহ ও হতাশা ছিল। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের পদের ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিলনা। কলেজ প্রতিষ্ঠার অনিশ্চয়তার কারণে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা থেকে কোন চাঁদা বা অনুদান নিতে চাননি। সেজন্য কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম ২ বছরে কেউ কোন চাঁদা বা অনুদান দেয়ার প্রমাণ দিতে সক্ষম হবেন না। শুরুতে কলেজের ব্যানার লেখায় চৌকসের মুকুল মিয়া নামে মাত্র খরচে কিছু সহযোগিতা করেছেন। পরে মি. হানিফ শুধুমাত্র খরচের বিনিময়ে সব ব্যানার লিখে দেন। হ্যান্ডবিল ও পোষ্টার ছাপানো বাবদ ফেন্সী প্রেসের মালিক বর্তমানে মরহুম এবং শরিয়ত প্রেসের মালিক কম খরচে বেশ সহযোগিতা করেন, কলেজ প্রতিষ্ঠার ১ম ২/৩ বছর পোষ্টার হ্যান্ডবিল ও ব্যানারে প্রচুর প্রচার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় ইসলামিয়া রোডের পারভিন হোটেলের মালিক মমিন মিয়া বাকীতে সব আপ্যায়ন (খাবার ও চা নাস্তা) সরবরাহ করতেন। কারণ কলেজের তখনও আয় তেমন ছিলনা, কাঠ মিস্ত্রী খুরশীদ আলমের বাকীতে কাঠ সরবরাহ ও কলেজের ১ম গৃহ নির্মাণের সহযোগিতা, মাইজদী বাজারের টিন ব্যবসায়ী মি. খোকন মিয়ার বাকীতে টিন সরবরাহ, স্থানীয় শাহাবুদ্দিন সাহেবের পুরাতন আল ফারুক একাডেমীর ঘর ব্যবহার এবং নতুন করে ঘর নির্মাণ করে কলেজের অফিস এবং অধ্যক্ষের বাসা হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়ার কারণে কলেজ প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। দৈনিক জাতীয় নিশান পত্রিকার মাধ্যমে সম্পাদক জনাব কাজী মো. রফিক উল্যাহর কলেজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা ও অবদান ছিল। শহরের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উৎসাহ যোগান।

তখনকার জেলা শিক্ষা অফিসার আলহাজ্ব মো. মাহফুরুর রহমান ও ফ্যাসিলজি ডিপার্টমেন্টের সহকারী প্রকৌশলী আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার মরহুম মাইন উদ্দিন সাহেব বিভিন্নভাবে আর্থিক ও অন্যান সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। কলেজের অনুমোদনের ১ম স্বীকৃতি ফি দুই হাজার টাকার ড্রাফ্‌ট শিক্ষা অফিসার জনাব আলহাজ্ব মো: মাহফুজুর রহমানের টাকায় করা। মরহুম ডা: এ কে এম আনোয়ার হোসেন কলেজ প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা যুগিয়েছেন, মাঝে মাঝে কলেজ করতে না পারলে মুখ দেখাতে পারবেন না বলে মন্তব্য করতেন। কিন্তু বেশ উদ্যোগ ও দৃঢ়তা দেখে অনেকেই আশ্বস্থ হন। জনাব মো: আনোয়ার মির্জাকে কলেজের সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি করার এক বছরের মাথায় আর কলেজ প্রতিষ্ঠার ২ বছরের মাথায় তিনি নগদ দশ হাজার টাকার অনুদান প্রদান করেন অবশ্য পরবর্তীতে টিন বাবদ মি: খোকনকে ত্রিশ হাজার টাকার বাকী পরিশোধ বাবদ প্রদান করেন।

মাইজদী বাজারের মরহুম শফিকুর রহমান কলেজটি নোয়াখালী কলেজের পুরাতন ভবন অথবা মাইজদী বাজারস্থ কাচারী বাড়ির সরকারী খাস জমিতে অরুণ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা কল্পে বিভিন্নভাবে সহযোগিতার চেষ্টা করেন। এডভোকেট সারওয়ার উদ্দিন সাহেব কলেজটি এম এ ছাত্তার উচ্চ বিদ্যালয়ের পার্শ্বে স্থাপনের আগ্রহী ছিলেন। তাঁরই সহযোগিতায় কলেজটির ১ম অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে এম এ, ছাত্তার উচ্চ বিদ্যালয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিলো। তাছাড়া এডভোকেট এ বি এম জাকারিয়া, পৌর কমিশনার অহিদ উদ্দিন মুকুল, মিলন রেডিও সার্ভিসের মালিক মরহুম গোলাম মোস্তফা, বর্তমান জনতার আজকের সম্পাদক এডভোকেট মোহাম্মদ ফারুক, নোয়াখালী সরকারী কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সামছুল কবিরসহ বেশ কিছু ব্যক্তি বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। মরহুম বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী চেশায়ার ফাউন্ডেশন থেকে কিছু চেয়ার ও টেবিল, হামদর্দের আঞ্চলিক ম্যানেজার হাকীম কামাল উদ্দিন কর্তৃক বৈদ্যুতিক পাখা এবং বায়তুশ সাইফ দরবার শরীফের পক্ষ থেকে ২টি বৈদ্যুতিক পাখা প্রদান করা হয়।

জনাব মো: শাহজাহান স্থানীয় এমপি হিসেবে কলেজের জমির বরাদ্দ, কলেজে মাঠ ভরাটের জন্য গম বরাদ্দ এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এক লক্ষ টাকার অনুদানসহ কলেজের বিভিন্ন দরখাস্তের উপর সুপারিশ ও তদ্বীর করেন। তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী মেজর (অব:) আবদুল মান্নান কলেজের বিভিন্ন দরখাস্তে সুপারিশ ও ডিও লেটার প্রদান করেন, তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব মো: মশিউর রহমান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মো: নজরুল ইসলাম এবং জনাব হারিস উদ্দিনের ভূমিকা ও অবদান ছিল। তাছাড়া কুমিল্লা বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মজিদ প্রফেসর আনোয়ারুল হক এবং চট্টগ্রামস্থ শিক্ষা বিভাগের তৎতকালিন উপ-পরিচালক প্রফেসর মোশাররফ হোসাইন তখন কলেজের স্বীকৃতি ও অনুমোদনের বিষয়ে সহযোগিতা করেন। কলেজ অনুমোদনের পর জেলা প্রশাসককে পদাধিকার বলে কলেজ কমিটির সভাপতি করা হয়। পরবর্তীতে তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব কে এম ডি আবুল কালাম আজাদ নোয়াখালীতে যোগদান করলে প্রথম দিকে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে কিছু সহযোগিতা করলেও পরে স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক নেতার প্ররোচনায় কতিপয় ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কারণে ক্ষতি করেন। জনাব আশরাফ জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত ও কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করতে বাধ্য হন।

জনাব আশরাফ পেশাগতভাবে তখন এডভোকেট কিন্তু কলেজের কারণে ওকালতি করা হয়নি। এছাড়া সাপ্তাহিক নোয়াখালী বার্তা ও মাসিক নোয়াখালী দর্পণ পত্রিকা প্রকাশনা নিয়মিত করতে পারেননি। ওকালতির চেম্বারের জন্য কেনা চেয়ার টেবিল ও আলমিরা কলেজের অধ্যক্ষের অফিসে ব্যবহার করেছিলেন। ব্যক্তিগত যৎ সামান্য আয় রোজগার সব

কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে ব্যয় করতেন। কলেজ ভবন তৈরীর সময় কলেজের গৃহ নির্মাণ তহবিল সৃষ্টি কল্পে একশত টাকার কুপন ছাপানো হয়। এতে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এককালীন পাঁচশ হাজার টাকার অনুমোদনের ব্যবস্থা করেছিলেন, জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রশাসক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব নজরুল ইসলামের সহযোগিতায়।

কলেজ প্রতিষ্ঠার ২য় বছরে নোয়াখালী পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান মরহুম রবিউল হোসেন কচি কলেজের ভর্তির পোষ্টার ও হ্যান্ডবিল পৌরসভার সৌজন্যে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। কলেজটি স্বীকৃতি লাভের পর সকলের চোখ পড়ে এবং কলেজের গৃহ সম্প্রসারণের প্রয়োজনে আরেকটি গৃহ নির্মাণের জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠার ৩ বছরের মাথায় জনাব আলহাজ্ব মো: সিরাজুল ইসলাম সাহেব থেকে বিভিন্ন কিস্তিতে এক লক্ষ টাকার অনুদান পাওয়া যায় এবং সেই টাকা দ্বারা কলেজের নতুন একটা ঘর নির্মাণের কাজ করা হয়। এখন তাঁকে কলেজ কমিটির দাতা সদস্য পদ মনোনীত করার প্রস্তাব উঠে। কিন্তু পরবর্তীতে এডহক কমিটিতে দাতা সদস্য পদ না থাকায় জনাব আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলামকে শিক্ষানুরাগী সদস্য মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠায় জনাব আশরাফের ব্যক্তিগতভাবে প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার খরচ হয়। কিন্তু সেই টাকা দাবী করতে পারেননি বা তাঁকে সেই সুযোগ দেয়া হয়নি। সম্পূর্ণ অবৈধ ও অন্যায়ভাবে জুলুম করে তাঁকে তথাকথিত মিথ্যা ও ভূয়া অভিযোগের ভিত্তিতে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে কলেজ থেকে বিদায় দেয়া হয়। রাজনৈতিকভাবে কোন সাহায্য বা সহযোগিতা পাননি বা চাননি। আদালতের আশ্রয় নিয়ে রাগে, দুঃখে ও ক্ষোভে কলেজ ত্যাগ করেন এবং দেশ ত্যাগ করে প্রবাসী হন। দীর্ঘ ৯ বছর তিনি দেশের কথাও ভুলে যান। যেই কলেজটি তাঁর যৌবনের মূল্যবান ৩ বছর ব্যয় করে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই কলেজ তাঁকে অপসারণ করে বা বিদায় দিয়ে কলেজটির তেমন উন্নয়ন ও উন্নতি হয়নি দেখে বিস্মিত ও দুঃখিত হন।

এ লেখায় শিক্ষক কর্মচারীদের ভূমিকা ও অবদানের কথা উল্লেখ। কারণ তাঁরা যেই কাজ করেছেন বা যে ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন, তার বিনিময়ে চাকুরী লাভ বা বেতন পেয়েছেন এবং কলেজের অধ্যাপক পদের উপাধিসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছেন। এছাড়া করো ভূমিকা বা অবদান কিংবা অনুদানের বিষয় উল্লেখ না থাকলে স্মরণ করিয়ে দিতে অনরোধ করবো, তবে আমার জানামতে, কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম ২ বছরে কারও ব্যক্তিগত কোন চাঁদা বা অনুদান গ্রহণ করেনি বা পাননি। জনাব আশরাফ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কলেজ প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছিলের, যা ১০০% সত্য ও বাস্তব। এ ব্যাপারে যে কোন ব্যাখ্যা বা প্রতিবাদের আহ্বান রইলো। আমার জানামতে এ লেখায় কোন মিথ্যা বা ভুল তথ্য দেইনি, তবে কিছু ঘটনা বা তথ্য ভুলে যেতে পারি।

মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করাটা ছিল জনাব আশরাফের কর্মজীবনের শুরুতে একটা বিশেষ চ্যালেঞ্জ। এছাড়া একটা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার অদম্য ইচ্ছা কাজ করছে। নিজের চাকুরীর জন্য কলেজ করেনি কারণ তাঁর চাকুরী করার কোন লক্ষ্য বা ইচ্ছা ছিল না। তিনি মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র হিসেবে বেসরকারী যে কোন কোম্পানীতে ভাল বেতনে মার্কেটিং ম্যানেজারের চাকুরী পেতেন। মেজর মান্নান সাহেবের সাথে সম্পর্ক ও পরিচয়ের সুবাধে গার্মেন্টস বা বায়িং হাউজের উচ্চ পদে চাকুরী নিতে পারতেন, ভাল ছাত্র হিসেবে বিসিএস ক্যাডার বা অন্য যে কোন লাইনে চাকুরীর চেষ্টা করতে পারতেন। চাকুরী করে চাকর হবার কোন শখ বা ইচ্ছা না থাকায় এডভোকেট। ইনকাম ট্যাক্স এডভাইজার এবং কোম্পানী ও বিজনেস ল' কনসালটেন্ট হয়েছিলেন। ওকালতির সনদ রক্ষার্থে অবৈতনিক অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন। তাছাড়া মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক পদ ও বিভাগ কলেজে ছিলনা, তদুপরি অভিজ্ঞতার অভাবে অধ্যক্ষ পদের এমপিও ভূক্তি হতো না।

জনাব আশরাফকে অধ্যক্ষ পদ থেকে অপসারণ না করলেও তাঁর ওকালতির সনদ রক্ষা এবং ওকালতি করার জন্য কলেজের প্রতিষ্ঠাতা পদ রেখে অধ্যক্ষের পদ থেকে অব্যাহতি নিতেন। কিন্তু যারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে তাঁকে কলেজ থেকে বিদায় করে অতঃপর দেশ ত্যাগ করে প্রবাস হবার জন্য ভূমিকা রেখেছেন, তারা তার উপকার করছেন বলে মনে হয়। আল্লাহর রহমতে তিনি এখন নিজ নামে ১৫/২০ লক্ষ টাকার অনুদান দিয়ে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। ইতিমধ্যে তিনি প্রবাসী আয় থেকে তার চেয়ে বেশী পরিমাণ টাকা অনুদান ও সাহায্য হিসেবে বিভিন্ন লোক, সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গরীব আত্মীয়-স্বজনকে প্রদান করেছেন।

//////////////////////

প্রিন্সিপাল আশরাফুল করিম এডভোকেট
মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতার দাবীদার

মাইজদী পাবলিক কলেজ ১৯৯৪ সালে স্থাপিত। অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক নোয়াখালী বার্তা ও মাসিক নোয়াখালী দর্পনের সম্পাদক এবং প্রকাশক, চরবাটা সৈকত কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আশরাফুল করিম এডভোকেট তখন উক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অবৈতনিক প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরুতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে কোনোরূপ অনুদান বা চাঁদা তোলা হয়নি বা গ্রহণ করা হয়নি। প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আশরাফ ব্যক্তিগত তহবিল থেকেই সকল ব্যয়ভার বহন করেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী দুই বছরে অর্থাৎ ১৯৯৪-৯৫ সালে কেউ কোনোরূপ চাঁদা বা অনুদান প্রদানের প্রমাণ দিতে পারবেন না। ১৯৯৬ সালে জনাব মোঃ আনোয়ার মির্জা এককালীন মাত্র দশ হাজার টাকার অনুদান প্রদান করেন। জনাব মোঃ শাহজাহান তৎকালীন স্থানীয় সংসদ সদস্য হিসাবে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এক লক্ষ টাকার অনুদানের সুপারিশ করেন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে উক্ত টাকার চেক পাওয়া যায়। তিনি কলেজের জমি বরাদ্দ এবং মাটি ভরাটের জন্য গম বরাদ্দের সুপারিশ করেন। জনাব আশরাফ কর্তৃক তখন কলেজে গৃহ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং কিছুদিন বৃষ্টিতে ও রৌদ্রে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কাঠ ও গৃহের রক্ষা করেন। কলেজে বাকীতে টিন সরবরাহ করার জন্য জনাব মোঃ আনোয়ার মির্জা মাইজদী বাজারের টিন ব্যবসায়ী খোকন মিয়াকে অনুরোধ করেন এবং তাঁকে ত্রিশ হাজার টাকা পরিশোদ করেন। কাঠমিস্ত্রি মুরশীদ আলম তখন বাকীতে সব কাঠ সরবরাহ করেন ও গৃহ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেন। জনাব আশরাফ কর্তৃক প্রায় অর্ধেক টাকা পরিশোধ করা হয়। স্থানীয় পারভিন হোটেলের মালিক মমিন মিয়া বাকীতে কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের চা নাস্তা সরবরাহ করতেন।

তখন তৎকালীন জেলা শিক্ষা অফিসার আলহাজ্ব মোঃ মাহফুজুর রহমান, নোয়াখালী ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী মরহুম মাইন উদ্দিন ইঞ্জিনিয়ার এবং মরহুম ডাঃ একেএম আনোয়ার হোসেন কলেজ প্রতিষ্ঠায় বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেন। কলেজ স্বীকৃতির সময় বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ১ম নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে তাঁরা দায়িত্ব পালন করেন। জনাব আশরাফ একদিকে কলেজের একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অন্যদিকে কলেজের অবৈতনিক প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনে ছিলেন। শিল্পপতি জনাব আনোয়ার মির্জা কলেজের ১ম সাংগঠনিক কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং জনাব মোঃ শাহজাহান স্থানীয় জাতীয় সংসদের সদস্য হিসাবে কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় বেশ ভূমিকা ও অবদান রাখেন, কিন্তু তাঁরা কেউ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা দাবী করতে পারেন না কিংবা তাদেরকে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় না। ১৯৯৭ সালে জিটি টায়ারের মালিক আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলামকে কলেজের নতুন একটি ঘর নির্মাণের জন্য অনুরোধ করাহলে তিনি বিভিন্ন কিস্তিতে কলেজের অধ্যক্ষকে নগদ এক লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান করেন। দাতা হিসাবে তিনি বড় অংকের অনুদান প্রদান করায় তাঁকে দাতা সদস্য করা বা বলা যায়। তিনি উক্ত টাকার অনুদান প্রদান করার পরপরই জনাব আনোয়ার মির্জার সাথে কলেজের বিভিন্ন বিষয়ে দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং জনাব আনোয়ার মির্জা কলেজের বিষয়ে আগ্রহ ও উদ্যোগ হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু কলেজের তখনকার নির্বাহী কমিটিতে দাতা সদস্য হিসাবে থাকায় তিনি জেলা প্রশাসসক তথা সভাপতির সাথে বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত থাকায় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষকে অপসারণের জন্য কমিটির সভায় সচেষ্ট হয়ে ওঠেন।

জনাব আশরাফ ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও কর্ম-প্রচেষ্টায় কলেজের প্রতিষ্ঠা স্বীকৃতি এবং শিক্ষক কর্মচারীদের এমপিওভূক্তির সময় কতিপয় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা প্রশাসনের সহযোগিতায় শিক্ষক কর্মচারীদের তথাকথিত মিথ্যা ও ভূয়া অভিযোগের মাধ্যমে জনাব মুহাম্মদ আশরাফুল করিমকে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অবৈতনিক অধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারণের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ফলে তিনি বেশ দুঃখিত ও মর্মাহত হন। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষা ও স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য দেশ ত্যাগ করে বিদেশ গমন করেন। পরবর্তীতে তিনি বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হন এবং তার পক্ষে দেশে আসা সম্ভব হয়নি দীর্ঘ কয়েক বছর। ইতিমধ্যে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা পদ নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের শুরু হয় এবং বিভিন্ন লোকের কলেজের তথাকথিত প্রতিষ্ঠাতা হবার দাবী শোনা যায়।

মোঃ আনোয়ার মির্জা ও জেলা প্রশাসক তথা কলেজের সভাপতি কর্তৃক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অবৈতনিক অধ্যক্ষের অপসারণের পর কলেজের পরবর্তী কমিটিতে একবার জনাব মোঃ আনোয়ার মির্জাকে প্রতিষ্ঠাতা ক্যাটাগরীর সদস্য দেখানো হয় কিন্তু পরে অভিভাবক সদস্য 'হিসাবে এডহক' কমিটির অনুমোদন নেয়া হয়। তখন ঐ এডহক কমিটিতে আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলামকে শিক্ষানুরাগী সদস্য দেখানো হয়। পরে ঐ এডহক কমিটিতে জেলা প্রশাসককে সভাপতির পদ থেকে বাদ দিয়ে জনাব মোঃ শাহজাহানকে স্থানীয় সংসদ সদস্য হিসেবে পরিবর্তন করা হয়। এতে জেলা প্রশাসকসহ জনাব মোঃ আনোয়ার মির্জা কলেজের ব্যাপারে আগ্রহ এবং উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেন।

সভাপতি হিসাবে জনাব মোঃ শাহজাহান এমপি এবং শিক্ষানুরাগী সদস্য হিসাবে আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলাম কলেজের এডহক কমিটিতে থাকাকালীন শিক্ষক কর্মচারীদের এমপিওর টাকা উত্তোলনের জন্য নিয়োগ বৈধকরণসহ যাবতীয় কর্মকান্ড একজন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে সরকারী কলেজ থেকে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আতাউর রহমানকে

অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দান করা হয়। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অবৈতনিক প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের অবর্তমানে কলেজটিতে উন্নয়ন ও উন্নতির মুখ দেখেনি বহু বছর যাবত। এসময়ে কলেজের বিভিন্ন কার্যক্রমও গ্রহণ বা বাস্তবায়ন করা হয়নি। মোঃ শাহজাহানের পরে কলেজ কমিটির সভাপতি পদাধিকার বলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে করা হয়। যদিও জেলা সদরে কলেজ হিসাবেক জেলা প্রশাসক বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে করা উচিত ছিল। তত্ত্বধায়ক সরকারের আমলে কলেজের সভাপতি পদ থেকে মোঃ শাহজাহানের পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতির পদে দায়িত্ব পালনকালে আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলাম কলেজের সীমানা দেয়াল নির্মাণের জন্য কিছু অনুদান প্রদান করেন এবং পৌরসভা কর্তৃক কলেজের গেইট নির্মাণ ও জেলা পরিষদ কর্তৃক একটি শ্রেণী কক্ষ নির্মাণের প্রকল্প নেয়া হয়। বর্তমানে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলামের দাবী হাস্যকর এবং সম্পূর্ণরূপে সত্যের অপলাপ, কারণ কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরুতে তাঁর কোনরূপ ন্যূনতম ভূমিকা বা অবদান ছিল না।

জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম কলেজ কমিটিতে তাঁর অনুদানের কারণে আজীবন দাতা সদস্য দাবী করতে পারেন বা থাকতে পারেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতার ক্যাটাগরীর সদস্য পদে আজীবন থাকতে পারবেন না। বর্তমানে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রবাসে অবস্থান করায় তিনি কলেজ কমিটির প্রতিষ্ঠাতা ক্যাটাগরীর সদস্য থাকলেও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা দাবী করা বা স্বীকৃতি পেতে পারেন না। দীর্ঘ দশ বছর পর প্রবাস থেকে এসে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আশরাফুল করিম কলেজের উন্নয়ন ও উন্নতি হয়নি দেখে দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন পত্র পত্রিকা প্রতিষ্ঠাতার বক্তব্যহ বিভিন্ন সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এছাড়া কলেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রতিষ্ঠাতার নিকট বহু প্রমাণাদি রয়েছে বলে তিনি দাবী করেন এবং কলেজের সভাপতির বরাবর এ ব্যাপারে একটি পত্র প্রেরণ করেন বলে জানা গেছে। উক্ত পত্রে মুহাম্মদ আশরাফুল করিম এডভোকেট তাঁকে মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের অনুরোধ করেন। যেহেতু মোঃ আনোয়ার মির্জা ১ম বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কমিটির দাতা সদস্য এবং আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলামকে পরবর্তীতে এডহক কমিটিতে শিক্ষানুরাগী সদস্য হিসাবে দেখানো হয়েছে, সেহেতু তাদের উভয়ের কেহই প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা ও অবদানের জন্য ব্যক্তিগত অনুদান বা অবদানের অভাবে প্রতিষ্ঠাতা করা যায় না। এমতাবস্থায় মুহাম্মদ আশরাফুল করিম এডভোকেটকে একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা ঘোষণা ও স্বীকৃতি প্রদান আবশ্যক।

//////////////////////

জনাব আশরাফ কিভাবে মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রিন্সিপাল হলেন?

জনাব আশরাফ কিভাবে মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল হয়েছেন এবং কিভাবে সে পদ থেকে দূরে সরে গেলেন, তা অনেকের অজানা রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করেই অব্যাহতি নেনইনি বা পদত্যাগ করেননি বরং ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে সরানো হয়েছে প্রিন্সিপাল পদ থেকে। তিনি কিভাবে প্রিন্সিপাল হলেন সেটা লেখার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা এতদিন দেখা দেয়নি। কিন্তু অল্প বয়সেই অভিজ্ঞতা ছাড়া বা অধ্যাপনা না করেই অধ্যক্ষ হবার সুযোগ বা যোগ্যতা, কিভাবে হলো তা আজ লেখার ইচ্ছা হলো। অধ্যক্ষ হবার বিড়ম্বনা কিংবা খুব কষ্ট ও পরিশ্রম এবং অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনের স্মৃতিচারণ করতে এ লেখায় হাত দিয়েছি। কাউকে ছোট বা হেয় করা কিংবা ঢাকঢোল বাজানোর জন্য এ লেখা নয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কেউ অধ্যক্ষ হতে চাইলে বা অধ্যক্ষ হতে পারলে বা অধ্যক্ষ হবার পর দায়িত্ব পালনের সময় সাবধানতা অবলম্বনের জন্য এ লেখা কাজে আসলে লেখার সার্থকতা হবে এবং আমিও খুশী হবেন।

জনাব আশরাফ জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের মধ্যে ছাত্র জীবন থেকে কোন সময়ই অধ্যাপনা করা বা অধ্যক্ষ হবার কোন ইচ্ছা বা কল্পনাও করিনি। পেশা হিসেবে শিক্ষকতা করা বা শিক্ষক হবেন এমন চিন্তা বা চেষ্টা কোন সময়েই করেননি। কিন্তু কর্মজীবনের শুরুতে নামের সাথে অধ্যাপক পদবী লেখার লোভ শুরু হয়। সেজন্য বিনা বেতনে তথা অবৈতনিক অধ্যাপনা করতে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাম ছিল। বলাবাহুল্য ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। অধ্যাপক হিসাবে এমনকি অধ্যক্ষ হিসাবে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা কলেজ থেকে কোন বেতন নেনইনি। কোথাও তিনি ইন্টারভিউ দিয়ে অধ্যাপক হননি। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ কিংবা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেছেন কিন্তু তার মেয়াদ বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। তিনিও স্থায়ীভাবে ঐ পদে থাকতে চাননি।

১৯৮২ সনে ইন্টারমেডিয়েট তথা এইচ এস সি পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগের মেধা তালিকায় কুমিল্লা বোর্ডে চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ থেকে দ্বিতীয় স্থান লাভ করার সুযোগে দেশব্যাপী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরীপে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগ লাভ করেন। সেই দায়িত্ব পালনের সময় স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহের কাজ বেসরকারী শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারনা ও মায়া জন্মে। বেশ কিছু শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে সম্পর্ক ও পরিচয়ের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজেকে সক্রিয়ভাবে জড়িত করার সাধ জাগে। পরবর্তীতে মাসিক নোয়াখালী দর্পন ও সাপ্তাহিক নোয়াখালী বার্তার প্রকাশনা ও সম্পাদনের সময়েও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিশেষভাবে কলেজের) শিক্ষক কর্মচারীদের এমনকি প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে মেলামেশা ও যোগাযোগের সুযোগ ঘটে। সাংবাদিক ও শিক্ষক বা শিক্ষানুরাগীদের পারস্পরিক সম্পর্কে সুযোগ লাভ করেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত বেড়ে যায়।

১৯৮৪ সালের দিকে শিক্ষা ভবনের এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-শিক্ষিকার তদ্বীরে যাতায়াত করতে জেলা শিক্ষা অফিস, চট্টগ্রাম উপ-পরিচালকের অফিস এবং কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডে যাতায়াত ছিল। সে সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দীর্ঘদিন চাকুরী করার পর অবসরপ্রাপ্ত নোয়াখালী সমিতির সাবেক সেক্রেটারী জনাব মকবুল আহমদের সাথে ঐ সব তদ্বীরে যাওয়া আসা করেন। শিক্ষা ভবনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড: এ,এইচ,এম করিম সাহেবের কাছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজনে তদ্বীর করতে প্রায়ই যাতায়াত করেন। বেশ কিছু কলেজের অধ্যক্ষ ও তখন তাঁর কাছে আসতেন।

ছাত্রজীবনেই উপরোক্ত ঘটনা ও কার্যক্রমের কারণে কর্মজীবনের শুরুতেই সহজে অধ্যাপক হবার সুযোগ পান। কিন্তু এলএলবি পাশ ও এডভোকেট হবার জন্য আইনগত কারণে বেতনভুক্ত কর্মচারী তথা অধ্যাপক না হয়ে বিনা বেতনে তথা অবৈতনিক অধ্যাপক হন না তাও বেশী দিনের জন্য নয়। কেবল মাত্র নামের সাথে অধ্যাপক পদবী লেখার জন্য নাম বা সনদপত্র অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছিল, স্বীকৃতির প্রয়োজনে বা তাঁকে খুশী করার জন্য অনেকেই তাদের অধ্যাপক তালিকায় নাম রেখেছিলো। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় সেখানে অধ্যাপনা করার কথা ছিল। প্রথম প্রসপেক্টাসে অনারারী লেকচারার হিসেবে নাম ছাপা হয়েছিলো। কিন্তু সেখানে চাকুরী করা হয়নি। ঢাকার তেজগাঁও কলেজ এবং নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজে মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করার জন্য আবেদনপত্র জমা দিলেও সে সব কলেজেও চাকুরী করা হয়নি।

ছাত্রজীবনের শেষ দিকে নোয়াখালীর শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী পরবর্তীতে মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদ মেজর (অব:) আবদুল মান্নান সাহেবের সাথে পরিচয় ও সম্পর্কের কারণে উনার অনুদানের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও শিক্ষক কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ ঘটে। মোট কথা ওকালতি করার পূর্বে শিক্ষানুরাগী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য জেলা শিক্ষা অফিস, শিক্ষা বিভাগের উপপরিচালকের অফিস (ডিডিপি আই অফিস, চট্টগ্রাম) শিক্ষাবোর্ড, শিক্ষা ভবন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাতায়াত ও তদ্বীর করার কারণে কলেজ প্রতিষ্ঠার এবং কলেজের অধ্যক্ষ হবার কথা চিন্তা ও চেষ্টা করতে থাকেন। সেটাই তাঁর অধ্যক্ষ হবার মূল কারণ।

১৯৯২ সালে ঢাকায় এলএলবি অধ্যয়নকালীন সময়ে ঢাকা নাইট কলেজ নামে শান্তিনগরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজেকে সক্রিয়ভাবে জড়িত করেন। তখন "নাইট কলেজ" হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার সুযোগ সহজ ভেবেছিলেন। একজন সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ যিনি চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের তার অধ্যাপক ছিলেন, বর্তমানে জীবিত নেই উনাকে অধ্যক্ষ করে কলেজ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করা যায়নি এবং মিরপুর "মর্ডান কলেজ" নামে আরেকটা কলেজ শুরু করেন। কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন এবং অধ্যক্ষের পরবর্তী স্থানে অবস্থান ছিল, যদিও কাগজপত্রে শিক্ষকদের তালিকায় নাম ছিল। কলেজের অধ্যক্ষের অফিসের পাশে কাজ কর্মের জন্য আলাদাভাবে একটা অফিসও ছিল। কেউ কেউ তাঁকে সহযোগী অধ্যক্ষ বা ভবিষ্যতের অধ্যক্ষ বলতেন। কিন্তু সেই কলেজ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। তখন ইসলামী একাডেমী নামে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বেসরকারী ইসলামিক ক্যাডেট কলেজ) স্থাপনে কিছুদিন কাজ করেন। সেখানেও অধ্যক্ষ না হয়েও অধ্যক্ষের অনেক কাজ করেন। সেটাও ত্যাগ করেন পরবর্তীতে। ১৯৯৩ সালে চরজব্বার কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় এলাকায় প্রথম প্রিন্সিপাল হিসেবে তাঁর নাম প্রচারিত হয়। কিন্তু সেখানে প্রিন্সিপাল হতে পারেননি বা হননি বা আবেদন করেননি। কেবলমাত্র লোকজনের মুখে মুখে তা ছিল। তাঁরও তাতে সায় ছিল। পরে এলাকার উদ্যোক্তাগণ এসিটেন্ট প্রিন্সিপাল হতে অনুরোধ করেন। যদিও সে রকম পদ সরকারীভাবে ছিল না, তখনই চরবাটায় একটা কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা উঠে এবং উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। চরজব্বারের সাথে চরবাটার একটা প্রতিযোগিতা অনেক আগে থেকেই চলে আসছিল। সেখানে অধ্যক্ষ হবার জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি রাজী হন এবং কাজ শুরু করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৮ বছর।

১৯৯৪ সালে এলএলবি পাশের পর বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সনদ লাভ করার কারণে ওকালতি করতে মাইজদী চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন। চরবাটায় সৈকত কলেজে অবৈতনিক অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেন। বড় ধরনের কোন ঘটনা বা কেলেংকারী কিংবা চরবাটায় স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ লাভের পূর্বেই তিনি নোয়াখালী শহরে চলে আসেন এবং কলেজে না যাবার বা অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন না করার চিঠি পাঠান। কিন্তু অকৃতজ্ঞ এলাকাবাসী বা কলেজের শিক্ষক কর্মচারীরা বিদায় দিতে একটা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানও করার প্রয়োজন মনে করেনি। তিনি সেটার জন্য কাঙ্গাল ছিলেন না। কষ্ট ও পরিশ্রমসহ আত্মত্যাগ (বিনা বেতনে অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করা) আশা করি আজীবন বলে যেতে পারবেন। জনাব আশরাফ

নোয়াখালী শহরে ওকালতি শুরু করার সময়ে নোয়াখালী নৈশ কলেজের অবৈতনিক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু অধ্যাপিকা হিসেবে বেতন ভাতা প্রাপ্ত এক মহিলার এবং কিছু লোকের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। অথচ নোয়াখালী নৈশ কলেজে তাঁর কিছু অবদানও রয়েছে। তাঁর হাতে পড়লে কলেজটার অপমৃত্যুও হতো না। সেই সময় কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা ছিলেন এম এ তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত এক মহিলা নামে মাত্র। তখন কিছু লোকের অনুপ্রেরণায় নোয়াখালী শহরে একটা ইন্টারমেডিয়েট সম্ভব হলে পরবর্তীতে ডিগ্রীর জন্য বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময় নোয়াখালী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে এইচ এস সি তথা ইন্টারমেডিয়েন্ট পর্যায়ে ভর্তি বন্ধের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটা চিঠির কারণে সেটার গুরুত্ব ও প্রয়োজন দেখা দেয়। ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর একক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় অনেকেই সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তিনি প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নিজেই প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করা শুরু করেন। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত কলেজটি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে অবৈতনিক প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের সময় অস্থায়ীভাবে কিছু শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করেন। ওরা সকলেই তাঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবে এসে ধর্না দেয় বা চাকুরী লাভ করে। যৌবনের মূল্যবান সময় তিনি কলেজটির জন্য ব্যয় করেন। শুধুমাত্র সুনাম ও সুখ্যাতির জন্য বিনা বেতনে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হয়েছিলেন জনাব আশরাফ। বহু কষ্ট স্বীকার ও পরিশ্রমের পর কলেজটির স্বীকৃতি লাভ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতার অনুদান বরাদ্দ (এমপিওভুক্ত) হবার সময়েই তাঁর বিরুদ্ধে অকৃতজ্ঞ শিক্ষক কর্মচারীদের আবেদন এবং স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক নেতার প্ররোচনা কলেজের সভাপতি ও তৎকালীন জেলা প্রশাসক সাহেব তাকে অবৈধভাবে প্রথমে কলেজ থেকে ছুটি প্রদান ও পরে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ দেন। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের আচরণ, তাঁর অফিসের তালা বদল করে তা দখল করা, একজন মীরজাফরের ভূমিকায় অবর্তীন শিক্ষকের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন, মহিলা শিক্ষিকাদের তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানীর মিথ্যা অভিযোগ সহ অপমানে ও দুঃখে তিনি কলেজে যাওয়া বন্ধ করে। যেন পরে অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে আনিত ঐ সব হাস্যকর ও কাল্পনিক অভিযোগ সমূহ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রিন্সিপাল হওয়া আর হয়নি। তিনি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন ও দেশ ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে তিনি বিদেশের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এড কোর্সে ভর্তি হন। তাঁর প্রিন্সিপাল হবার শুরু ও শেষ সম্পর্কে অনেকেই দেশে-বিদেশে জানতে চান। সাথে সাথে নতুন অনেকের কাছেও বিষয়টি অজানা। তাই লেখাটি লিখলাম। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ফসল স্বরূপ তাঁর প্রিন্সিপাল পদ হারালেও প্রথমে আর্থিক ভাবে তিনি বেশ স্বচ্ছল হয়েছেন। তিনি ইচ্ছে করলেই অনুদান দিয়ে নিজের নামেই একটা কলেজ করতে পারেন প্রজন্মের সেই সামর্থ্য আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। জনাব আশরাফ জেনে শুনেই তখন প্রিন্সিপাল পদকে অবৈতনিক করেন। আর অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁর এমপিওভূক্তি হতো না বা অধ্যক্ষ পদের বেতন স্কেল পাওয়া যেতো না। তাছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিষয় হিসেবে মার্কেটিং বিষয় না থাকায় তাঁর তো কলেজে চাকুরীরও নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা হবার কারণে তিনি তা করেন তখন কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের এসএসসি ও এইচ এস সি পরীক্ষায় ২ বার মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত কোন কৃতি ছাত্রের প্রিন্সিপাল হওয়া খুবই আশ্চর্য ও ব্যতিক্রম ছিল। বোর্ডের চেয়ারম্যান ও কলেজ পরিদর্শকসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বলতেন, তিনি কেন অন্য পেশা বা চাকুরীতে যোগদান না করে বিনা বেতনের অধ্যক্ষ হলেন। তাছাড়া নোয়াখালীসহ দেশের কোন কলেজে তাঁর মত শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী অধ্যক্ষের পদে ছিল কিনা তা বলা মুশকিল। কিন্তু তিনি নাম সুনাম ও পরিচিতির জন্য প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হন।

কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য, তাঁর প্রিন্সিপাল হওয়া বা মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হওয়াকে অনেকেই সহ্য করতে পারেনি। হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতায় অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে অধ্যক্ষ পদে থাকতে দেয়নি। বর্তমানে তিনি প্রবাসে সুপ্রতিষ্ঠিত।

//////////////////////

মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়ের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত

মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বহু ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন। তার মধ্যে কিছু ছিলো হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রিকাতরতা এবং বাকী ছিল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অথবা প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা লাভের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত। জনসেবা, সমাজ কল্যাণ ও এলাকার উন্নয়নের ব্রত নিয়ে জনাব আশরাফ মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শিক্ষকতা তাঁর পেশা ছিল না বা অধ্যাপনা করে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অধ্যক্ষ হবার যোগ্যতাও ছিল না। তবে মেধা ও দক্ষতা এবং শিক্ষা বিভাগের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক থাকার কারণে এবং ২৮ বছর বয়সে চরবাটা

সৈকত কলেজের প্রথম অবৈতনিক অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালনে কোনো সমস্যা বা অসুবিধা হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত না হলেও তখন তাঁর কর্মের মাধ্যমে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বাধা বিঘ্নের মোকাবিলা করেছিলেন।

জনাব আশরাফ যখন ১৯৯৪ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন বা উদ্যোগ গ্রহণ করেন সে সময়ে বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী (বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি বর্তমানে মরহুম) সাহেবের সাথে তাঁর যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল। কলেজের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে প্রথম প্রচারপত্রে ও প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উনার নাম ব্যবহার করা হয়। উনার সম্মতি নিয়ে এবং একটা ড্রাফট কপি ওনাকে দেখিয়ে ঐ হ্যান্ডবিলে বা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বেশ কিছু লোকের নাম ছিল। সেটা ছাপা হবার একদিনের মাথায় ফোন করে উনি উনার নাম ব্যবহার না করার অনুরোধ জানান। উনি বলেছিলেন, উনাকে ফোন করে কেউ কেউ নাকি উনার নাম ব্যবহার করে কলেজ প্রতিষ্ঠার নামে চাঁদা তোলা বা ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক লাভবান হবার কথা বলেছে। তখন খুব বিনয়ের সাথে উনার নাম আর ব্যবহার বা প্রচার না করার কথা জানানো হয়। কিছুদিন পর অশ্বদিযার শিল্পপতি বর্তমানে মরহুম সামসুল হুদা সাহেবও কলেজের পৃষ্ঠপোষকতার তালিকায় উনার নাম ব্যবহার না করার জন্য বলেন। পরে সেই হ্যান্ডবিল ও প্রেস বিজ্ঞপ্তি আর প্রচার বা তাঁদের নাম ব্যবহার করেনি। বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী সাহেবের সাথে উনার প্রতিষ্ঠিত চরক্লার্ক বাংলাবাজারে লর্ড লিউ নাউ চেশায়ার হাইস্কুলের কারণে যোগাযোগ ছিল এবং তিনি জনাব আশরাফের অনুরোধে মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় চেশায়ার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নামক এনজিও থেকে কিছু আসবাবপত্র প্রদান করেন। পরবর্তীতে তৎকালীন বৃটিশ হাই কমিশনারের নোয়াখালী সফরের সময় একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় উনার সম্মানে। কিন্তু উনার কাছে জনাব আশরাফের বিরুদ্ধে বহু মন্তব্য কিংবা সমালোচনায় শেষ পর্যন্ত তিনি যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। অথচ ষড়যন্ত্রকারীরা যদি তা না করতো তাহলে উনাকে দিয়ে কলেজটি প্রতিষ্ঠায় আরও সাফল্য লাভ হতো। উনি ব্যক্তিগতভাবে জনাব আশরাফকে ভালো জানতেন ও তাঁর কাজকর্মে খুশি ছিলেন। কিন্তু মানুষের কান কথায় কিংবা নানা অভিযোগ ও অপবাদে সম্পর্কটা শিথিল হয়ে যায়। মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরুতে এরূপ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত কেবল হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরাতার কারণেই হয়েছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

মাইজদী পাবলিক কলেজ চালুর জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা ভবন ছিল না। নোয়াখালীর জেলা সদর মাইজদীতে বহু সরকারী অব্যবহৃত জমি ও টিনশেড গৃহ থাকায় গণপুর্ত বিভাগের কাছে জেলা প্রশাসক সাহেবের মাধ্যমে আবেদন করা হয়। কিন্তু গণপূর্ত বিভাগ থেকে তখন সাড়া পাননি বরং কেউ কেউ তার বিরোধিতা করেছেন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করেছেন যেন গণপূর্ত বিভাগের কোন টিনশেড ঘর ব্যবহার করতে না পারেন। নোয়াখালী আইন কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর কিছু অবদান ও ভূমিকা থাকার এবং কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ আলহাজ্ব ফিরোজ উল হক চৌধুরী এডভোকেট সাহেবকে কলেজের আহ্বায়ক কমিটির আহবায়ক করে উনার কলেজ ভবন দিনের বেলায় ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে একটি দরখাস্ত দেন। পরদিন কলেজের ছাত্র সংসদের প্যাডে একটি আপত্তির দরখাস্ত ও কয়েকজন ছাত্রের জেলা প্রশাসক সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে তার বিরোধিতা করায় সে উদ্যোগ আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

যদি তখন গণপূর্ত বিভাগের কোন পরিত্যক্ত টিনশেড ঘর বা নোয়াখালী আইন কলেজ ভবন ব্যবহার করতে পারতেন। তবে ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে বোর্ড কর্তৃক অনুমতির ব্যবস্থা হতো। চট্টগ্রামস্থ শিক্ষা পরিদপ্তরের তৎকালীন উপপরিচালক অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন সাহেব বহু চেষ্টা তদ্বীর করেছিলেন বোর্ড থেকে ছাত্র ছাত্রী ভর্তির অনুমতির ব্যাপারে। কিন্তু কলেজের অস্থায়ী ভবন বা ঘর না দেখাতে পেরে সে যাত্রায় ব্যর্থ হয় কিছু লোকের হীনমন্যতা ও বিরোধিতার কারণে। কলেজের জন্য অত:পর তড়িঘড়ি করে ছাত্রছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও প্রচারের লক্ষ্যে জনাব মোঃ আনোয়ার মির্জার শরণাপন্ন হয়ে উনাকে কলেজের সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি বানিয়ে অরুণচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে মর্নিং শিপটে কলেজের ক্লাশ ও কার্যক্রম চালুর দরখাস্ত করা হয়। বিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন জনাম মোঃ আনোয়ার মির্জা এবং সহ-সভাপতি ছিলেন মরহুম শফিকুর রহমান। তাকে কলেজ কমিটির সদস্য করা হয়। উনি অরুণ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী ভুলুয়া কাচারীর সরকারী জমিতে কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু অরুণ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভায় মাইজদী পাবলিক কলেজ চালুর সিদ্ধান্ত অনুমোদন হয়নি। কলেজ প্রতিষ্ঠা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। পরে হরিনারায়নপুর হাইস্কুলেও মর্নিং শিফটে কলেজ চালুর প্রস্তাব করা হয় কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ সায় দেয়নি। প্রভাতী স্কুলে কলেজ চালু করার পর পার্শ্ববর্তী সরকারি জমিতে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হলে উক্ত জমিতে মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক এবং সরকারী কর্মচারী সমিতির সদস্যদের গৃহ নির্মাণের আবেদনের কারণে জেলা প্রশাসক সাহেব তাতে রাজী হননি। অত:পর এম এ ছাত্তার উচ্চ বিদ্যালয়ে কলেজের অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করে কলেজের কার্যক্রম শুরু করা হলেও বোর্ডের ছাত্রছাত্রী ভর্তির অনুমতির অভাবে ভর্তিকৃত কিছু ছাত্রছাত্রীকে বাঁধের হাট এ এম কলেজের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করা হয়। তখন বহু লোক বহু রকমের মন্তব্য ও তিরস্কার এবং সমালোচনা করেন। জনাব আশরাফ ব্যক্তিগতভাবে অপমান বা তাঁর বিরুদ্ধে বিরূপ

ধারণা সৃষ্টির অনেকের উদ্যোগ ছিলেন। তাঁর বয়স কম হবার কারণে অনেকের নিকট সেসময় চক্ষুশূল ছিলেন। তিনি দেশে বিদেশে আইনজীবি, ট্যাক্স ও ভ্যাট এডভাইজার, বিজনেস, লেবার ও কোম্পানী ল' বিশেষজ্ঞ এবং ম্যানেজমেন্ট ও ম্যার্কেটিং কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। তবুও তিনি অনেক ধৈর্য ও ত্যাগ স্বীকার করে কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খুব উদ্যোগী ছিলেন। তখন তাঁর সাথে ২/৩ জন শিক্ষক কর্মচারী কিছু কাজকর্ম করেছে। যেহেতু কলেজ পুরোদমে চালু হয়নি তাই শিক্ষক কর্মচারীর তেমন প্রয়োজন ছিল না। এভাবে একটা বছর নষ্ট হয়ে গেছে। কেউ তেমন বড় ধরনের সাহায্য বা সহযোগিতা করেনি বরং তা যেন ব্যর্থ হয় সেই অপপ্রচেষ্টা অনেকেই করেছে। তখন জনাব আশরাফের চরবাটা কলেজ ত্যাগ করার পেছনে অনেকেই অতি উৎসাহে অনেক অনুসন্ধান বা বিরূপ সমালোচনা করেছে। তাঁর সাংবাদিকতার সাথে জড়িত থাকার কারণে পত্র পত্রিকায় ব্যাপক প্রচার ও প্রকাশনা অব্যাহত রেখে কলেজের জন্য জমি সংগ্রহ ও গৃহ নির্মাণের চেষ্টা অব্যাহত থাকে।

অত:পর তৎকালীন মন্ত্রী জনাব মেজর (অব:) আবদুল মান্নান ও স্থানীয় তৎকালীন সাংসদ জনাব মো: শাহজাহানের সাথে বেশ যোগাযোগ করে গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমেই উক্ত কলেজের জন্য জমি বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ এবং আল ফারুক একাডেমীর পুরাতন ঘর মালিকের নিকট থেকে ভাড়া নেয়া হয়। নিজের টাকায় সেখানে মালিকেরই বাসার পাশে বাসা ভাড়া নেয়া হয় কলেজ অধ্যক্ষের অফিস সেখানেই শুরু করেন। তখন থেকে কলেজে চাকুরীর জন্য কিছু শিক্ষক এবং কর্মচারী যোগাযোগ শুরু করে। কলেজের জমি বরাদ্দের সময় থেকে বহু সংখ্যক নামে ও বেনামে কলেজের বিরুদ্ধে এবং উক্ত জমির বরাদ্দ না পাবার বিষয়ে বহু দরখাস্ত জেলা প্রশাসন, পূর্ত ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ডে জমা পড়ে। কিন্তু মেধা ও যোগ্যতার সাথে কর্মপ্রচেষ্টায় সেসব দরখাস্তের কাজ হয়নি।

জনাব আশরাফের কাছে বহু লোক তার ছেলে বা মেয়ে কিংবা ভাই বা বোন অথবা বন্ধুর চাকুরীর জন্য বহু রকমের চেষ্টা তদবির ও যোগাযোগ করেছে। শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ ও যোগদানের কাহিনী আরেকটি লেখায় প্রকাশ করার ইচ্ছায় এখানে লিখলাম না তবে তাঁর দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীরা মীর জাফরের ভূমিকায় বেঈমানী ও বেয়াদবীর যে দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ সৃষ্টি করেছে তা বর্তমানে বলাই বাহুল্য। অনেকেরই তা জানা আছে। তারা তাঁর ২/৩ টা বিয়ে পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করেছে। সে সময় তিনি অবিবাহিত থাকায় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের যৌন হয়রানীর খরব পত্র পত্রিকায় বেশ প্রচার ও প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে কলেজের সুন্দরী মহিলা প্রভাষিকাদের যৌন হয়রানীর মত অভিযোগ আনা হয়। তিনি তা ধৈর্যের সাথে সহ্য ও মোকাবিলা করেন। তাঁর নিজের টাকায় শুরু হওয়া কলেজের অবৈতনিক অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করার পরও শিক্ষক কর্মচারীদের দরখাস্তে তাঁর বিরুদ্ধে কলেজের বহু লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ হাস্যকার ছিল। সে সময়ে নোয়াখালীর কিছু স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা কুচক্রীমহল শিক্ষক কর্মচারীদের ভূয়া ও কাল্পনিক অভিযোগকে হাতিয়ার করে জেলা প্রশাসক ও জনাব মোঃ আনোয়ার মির্জাকে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অপপ্রচেষ্টা চালায়। তিনি তাদের অনেককে চিনেন ও জানেন তাদের অনেকের সাথেই তাঁর পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল। তারা হয় হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার কারণে বা হীন স্বার্থ হাসিলের জন্য তখন তাঁর বিরুদ্ধে বেশ উঠে পড়ে লেগেছিল। তিনি দৃঢ়তার সাথে বিভিন্ন দপ্তরে দাখিল করা ভূয়া ও বেনামী অভিযোগের মোকাবিলা করেন এবং উক্ত জমিতে কলেজের গৃহ নির্মাণ ও মাটি ভরাট করে কলেজের ক্লাশ ও কার্যক্রম শুরু করেন। তারপরও দুর্নীতি দমন বিভাগে তাঁর বিরুদ্ধে কলেজের নামে বহু টাকা আত্মসাত, মাটি ভরাটের জন্য বরাদ্দকৃত গমের টাকা আত্মসাত ও সরকারী জমি আত্মসাতের বহু দরখাস্ত জমা হয়। ঐ সবেরও মোকাবিলা করতে বহু কষ্ট ও পরিশ্রম করেছেন। ব্যক্তিগত সততা ও কর্মতৎপরতায় ঐসব অভিযোগের ফল শূন্য হয়ে যায়। জনাব মোঃ আনোয়ার মির্জাসহ তৎকালীন জেলা প্রশাসকের নিকট স্থানীয়, কিছু রাজনৈতিক নেতা ও কুচক্রীমহল তাঁর বিরুদ্ধে নানা কথা বলে বহু ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে। কোনরূপ ফল না পেয়ে বা তাঁর বিরুদ্ধে কিছু না করতে পেরে তাঁর দ্বারা নিয়োগকৃত শিক্ষক কর্মচারীদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।

জনাব আশরাফকে কলেজ থেকে বের করে দেয়ার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জালে তাঁর হাতে পায়ে ধরে চাকুরী পাওয়া শিক্ষক কর্মচারীরা তাঁর বিরুদ্ধে কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাত এবং সুন্দরী মহিলা প্রভাষিকাদের যৌন হয়রানীর মত হাস্যকার ও মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করে। জেলা প্রশাসক ও কলেজ কমিটির সভাপতি দ্বারা তাঁরও কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে সাসপেন্ড করা হয়। তখন তিনি আদালতের আশ্রয় নেন। তিনি যদিও সাসপেন্ড অবস্থায় কলেজে যেতে পারছেন তবুও তিনি কলেজে না যাবার সিদ্ধান্ত নেন এবং বিয়ে করে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য দেশত্যাগ করে প্রবাসে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কলেজ এভাবে ত্যাগ করেন।

জনাব আশরাফ যে ছাত্রজীবনে মেধাবী ও কৃতি ছাত্র ছিলেন, সব যে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কলেজ করার অভিজ্ঞতা ছিল না তিনি সে সময়ও ওকালতির সনদ নিয়ে এডভোকেট ছিলেন কিংবা সাংবাদিক ছিলেন সেটার গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নানা কাহিনীসহ ভূয়া ও মিথ্যা অভিযোগ প্রচার তাঁকে ব্যথিত করে। এমপি সাহেব, মির্জা সাহেব ও তৎকালীন

জেলা প্রশাসক তাঁর বিরুদ্ধে আনীত ঐসব ভূয়া ও মিথ্যা অভিযোগ জেনেও কিছু লোকের কান কথায় বা প্ররোচনায় তাঁর উপর ক্ষুদ্ধ হন। কলেজ থেকে তাঁকে সরিয়ে বা বাদ দিয়ে কিছু কিছু লোক বিভিন্ন লোকের নাম প্রচার করা শুরু করে অধ্যক্ষ বানানোর জন্য তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভকারী কলেজের বিনা বেতনে অধ্যক্ষ পদে কাজ করার পরও অন্য কাউকে বেতনভুক্ত অধ্যক্ষ বানানোর হীন প্রচেষ্টা যারা তখন করেছে তারা যে কত নিচু মনের ও বোকা ছি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কলেজ শুরুর প্রথম বছর কোন ব্যক্তি বা সংগঠন কলেজের জন্য কোন অনুদান বা চাঁদা প্রদান করার নজির নেই। কোন চাঁদা তোলা হয়নি বা চাঁদা তোলার রশিদ পর্যন্ত ছাপা হয়নি। প্রায় দু'বছরের সময় মির্জা সাহেব দশ হাজার টাকার অনুদান দেন। এমপি সাহেবের সুপারিশে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এক লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। তিন বছরের মাথায় আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম সাহেব বিভিন্ন কিস্তিতে এক লাখ টাকা প্রদান করেন। ফলে কলেজটি জনাব আশরাফের টাকায় ও মেধায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু পরবর্তীতে কলেজের প্রতিষ্ঠাতার পদ মর্যাদায় তাঁর নাম ও নিশানা মুচে ফেলার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত শুরু হয়।
//////////////////////

মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রতিষ্ঠার সময়ে একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত

নোয়াখালীর একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালের ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও পরশ্রীকাতরতার শিকারে জনাব আশরাফের প্রিন্সিপাল জীবনসহ ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ক্ষতিসাধন, মানসিক ও সামাজিক সমস্যা শেষ পর্যন্ত তার প্রিন্সিপাল পদ হারোনোর ঘটনা ঘটে। ইতিপূর্বে এক লেখায় তিনি কিভাবে প্রিন্সিপাল হলেন এবং প্রিন্সিপাল জীবনের ইতিবৃত্ত লিখেছিলেন। আজকের লেখায় একজন প্রিন্সিপালের কর্মকান্ড বর্ণনা করা হলো। বর্তমানে ঐ প্রিন্সিপালের উপর কোন ক্ষোভ বা দুঃখ নেই। কারণ তার কারণেই হয়তো আজ জনাব আশরাফ বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভে তার মেধা, শ্রম ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছেন। তিনি এখনও জীবনের শেষ প্রান্তে আসেননি, তবুও অজানা অথবা অপ্রকাশিত কাহিনী পরবর্তীতে কারও জীবনে কাজে আসবে বলে এ ধরনের লেখা প্রকাশ হওয়া দরকার। ঐ প্রিন্সিপাল সাহেব যদি এতে মনে কষ্ট পান তাহলে করার কিছুই নাই। সত্য সত্যই, সেটা মনে করেই উক্ত কাহিনী লেখা হলো।

অনেকেই জনাব আশরাফকে ঐ প্রিন্সিপাল সাহেবের ছাত্র মনে করতেন, কিন্তু বাস্তবে তিনি উনার ছাত্রই ছিলেন না, এমনকি বয়সে উনার ছেলের মত ছিলেন। তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা ভবন, শিক্ষা বোর্ড এবং জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষা অফিস সমূহে বিভিন্ন তদ্বীর বা প্রয়োজনে যাওয়া আসার কারণে বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকদের সাথে তার পরিচিতি ও সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। তখন প্রায়ই ৭০/৮০ জন্য অধ্যক্ষ তার দ্বারা উপকৃত হন বা তার কাছে এসেছেন। নোয়াখালী কলেজের উন্নয়ন ও অনার্স কোর্সের ব্যাপারে তার কিছু ভূমিকা ও অবদান ছিল। যদিও তিনি নোয়াখালী কলেজের ছাত্র ছিলেন না। স্থানীয় কলেজের এক অধ্যাপক সাহেবের বদলী ও পদোন্নতি এবং পরবর্তীতে সরকারী মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল পদে যোগদান বিষয়ে তার কোন ভূমিকা বা কার্যক্রম ছিলনা। তখন ঐ অধ্যাপক সাহেব তাকে প্রথম দিকে ছাত্র মনে করে ব্যবহার করতেন। তার সম্পাদনায় মাসিক নোয়াখালী দর্পণ ও সাপ্তাহিক নোয়াখালী বার্তা পত্রিকা প্রকাশনার সময় তিনি তার সাথে পরিচয় করেন। নোয়াখালী কলেজ থেকে দীর্ঘদিন পর উনার বদলী বা পদোন্নতি হওয়ার বিষয়ে কিংবা পরবর্তীতে স্থানীয় সরকারী মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগদান করা নিয়ে স্থানীয় বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরোধিতা বা পক্ষাবলম্বনে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি একবার তাকে সরকারী মহিলা কলেজে দাওয়াত দিয়ে বেশ আপ্যায়ন করেন।

ঐ প্রিন্সিপাল সাহেবের পদোন্নতি ও প্রিন্সিপাল হবার পর উনার জন্ম তারিখ এবং নামের বিভ্রান্তির বিষয়ে একটা সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া শিক্ষা ভবনের ডিজি সাহেব উনাকে একবার তার অফিসে বেশ বকাবকি করেন। তিনি এসবের পেনে জনাব আশরাফের ভূমিকা রয়েছে বলে সন্দেহ করেন এবং তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার, বদনাম, সমালোচনা ও কুৎসা রটনা শুরু করেন। তখন নোয়াখালী সাংবাদিক সমিতির কাছে তার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করেন যে, তিনি নাকি উনার কাছে দু'হাজার টাকা চেয়েছিলেন শিক্ষা ভবন থেকে উনার মহিলা কলেজের জন্য একটা সাইকোষ্টাইস মেশিন বরাদ্দ করে দিতে। সমিতি সে অভিযোগের তদন্ত করে। তিনি তখন ঐ প্রিন্সিপাল সাহেব এবং সমিতির বিরুদ্ধে ঢাকা থেকে একটা লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়ে তার প্রতিবাদ জানান। এরপর সে ঘটনা আর বেশীদূর আগায়নি। মিথ্যা অভিযোগ বেশীদিন টিকেনি। তার পূর্বে তৎকালীন জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্রিকায় ছাপা হবার পর ঐ প্রিন্সিপাল সাহেব জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসারের কাছে তাকে তার ছাত্র বলে পরিচয় দিয়ে তার স্বার্থ আদায় করেন এবং তাকে ঐ

হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির অপপ্রচেষ্টা চালান। কিন্তু উনার ব্যক্তিগত বদলি, পদোন্নতি ও স্থানীয় সরকারী মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল পদে যোগদানের পর উনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ, মন্তব্য, সমালোচনা ও পক্ষ বিপক্ষের ভেতরে উনি তাকে উনার বিরুদ্ধবাদীদের দলের মনে করতেন। যদিও তিনি উনার পক্ষে বা বিপক্ষে ছিলেন না, এমনকি উনার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করতেন।

মহিলা কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-শিক্ষিকার বিভিন্ন তদ্বীরে আত্মনিয়োগ করেন। তখন বিভিন্ন বিষয়ে উনার কার্যক্রম ও ভূমিকা হয়তো তার পছন্দ ছিলনা বা বিরোধিতা করতেন। উনার বাসার কাছে অবস্থিত বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকাকে নিয়ে শিক্ষা বোর্ডে ও শিক্ষা অফিসে এবং শিক্ষা ভবনে তদ্বীরে তিনি ঐ প্রধান শিক্ষিকার পক্ষে ছিলেন। তিনি জনাব আশরাফকে বিপক্ষে মনে করতেন। তার বিরুদ্ধে তিনি শিক্ষা ভবন, শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা অফিস সমুহে বেনামে বিভিন্ন দরখাস্ত করেন। জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন স্থানেও উনার বেনামী বিভিন্ন দরখাস্তের মোকাবিলা করতে হয়েছে তাকে। তার সততা, নিষ্ঠা, ব্যক্তিগত সুনাম ও পরিচিতি এসব বেনামী ও ভূয়া দরখাস্তে তিনি তার কোন ক্ষতি করতে পারেননি। শুধু তাকে বিব্রত বা মানসিক ক্ষতিসাধন করেছেন। শহরে তার বিরোধী ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের উক্ত প্রিন্সিপালের ভূমিকা অনেক ছিল।

জনাব আশরাফ যখন চরবাটার সৈকত কলেজের প্রতিষ্ঠা লাভের সময় অবৈতনিক অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন, তখন লোকজনের তাকে প্রিন্সিপাল বলা বা সুনাম করা উনার হয়তো পছন্দ হয়নি। যেখানে তিনি প্রায় এক বছর বিনা বেতনে অধ্যাক্ষের দায়িত্ব পালন করেন যা দিবা লোকের মত সত্য ছিল। কলেজের শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ তার দ্বারা সম্পন্ন হয়। সেই শিক্ষক কর্মচারীদের নিয়োগ বৈধ করণের জন্য এবং এমপিওভূক্তির প্রয়োজনে কাগজপত্র তৈরীতে ঐ প্রিন্সিপাল সাহেব পূর্বের তারিখ দিয়ে স্বাক্ষর দেন। এতে জনাব আশরাপফের কোন আপত্তি ছিলনা। কিন্তু তার ঐ কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে অব্যাহতির রেজুলেশনে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেন তা শুধু লেখার অযোগ্যই নয় বাস্তব সত্যের পুরো বিপরীত ছিল। ঘটনা চক্রে সেই রেজুলেশনের কপি তার হাতে আসে এবং তিনি বিস্মিত হন। তখন একটি বেসরকারী হাই স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে উনার অপসারণ বা বিতাড়ণ হবার কারণে তিনি সেটা প্রাকৃতিক বিচার মনে করে চুপ থাকেন। ইতিমধ্যে উক্ত প্রিন্সিপাল হজ্বব্রত পালন করেন এবং নামের সাথে আলহাজ্ব শব্দ ব্যবহার শুরু করেন। ধারণা ছিল উনি আর জাগতিক বিষয়ে মন দিবেন না এবং উনার পূর্বের কর্মকান্ডের আত্মসমালোচনা বা অনুশোচনা করবেন। কিন্তু কুকুরের লেজ সব সময় বাঁকা থাকে। উনিও স্বভাব চরিত্র পরিবর্তন করেন নাই। জনাব আশরাফের বিরুদ্ধে তিনি বারবার হিংসা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করেন।

তার একক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে অবৈতনিক অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের সময় একটি কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের সাথে উনি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে লিপ্ত হন। তার বিরুদ্ধে রেজুলেশন ও তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ উনার ড্রাফট করা। তিনি উনার কার্যক্রম ও ভূমিকায় হতবাক ও হতভম্ব হন। শুধু আল্লাহর কাছে বলা ও অভিযোগ করা ছাড়া তার কোন উপায় ছিল না। তিনি ঐ সব মিথ্যা ও আপত্তিকর রেজুলেশন এবং তার সাময়িক বরখাস্তের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে সেসব হাস্যকর ও মিথ্যা অভিযোগের কবল থেকে তিনি মুক্তি পান। সত্যের জয় হয়। কিন্তু ঐ প্রিন্সিপাল সাহেব পরবর্তীতে বেগমগঞ্জের একটি কলেজ থেকে বরখাস্ত হন। ঘটনাক্রমে উনার বিরুদ্ধে রেজুলেশন ও সাময়িকভাবে উনার বরখাস্তের আদেশের ড্রাফট কারার জন্য জনাব আশরাফের হাতে আসে। তিনি উনার মত অভদ্র ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা থেকে দূরে থাকেন। উনি সে রেজুলেশন ও সাসপেন্ডের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রথম তারিখেই আদালতে উনার মোকাদ্দমা খারিজ হয়ে যায়। আল্লাহর বিচার বড় বিচার। জনাব আশরাফেল ক্ষতি করতে গিয়ে উনার অনেক ক্ষতি হয়েছে। সেজন্য উনার উপর তার কোন রাগ বা ক্ষোভ নেই। জীবদ্দশায় উনি কৃতকর্মের কিছু ফল ভোগ করেছেন। উনার ছাত্র ছাত্রীরাও উনাকে পছন্দ করেন না। নোয়াখালী শহরের অনেকেই তা জানে।

আজ জনাব আশরাফ বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার বিরুদ্ধে উনার এসব ষড়যন্ত্র চক্রান্ত ও পরশ্রীকাতরতা মনে উঠলে খুব চিন্তা করেন। তিনি কেন জনাব আশরাফের বিরুদ্ধাচারণ করতেন বা তাকে সহ্য করতে পারতেন না তা আমাদের জানা নেই। তবে উনি যে জনাব আশরাফের ক্ষতি করতে গিয়ে নিজেরই ক্ষতি করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জনাব আশরাফ তো দেশ ত্যাগ করে বিদেশে গেলেন। বর্তমানে তিনি সেখানে কিছু আয় রোজগার করছেন এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএড কোর্স করেছেন। আর্থিকভাবে উক্ত অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল খুব একটা স্বচ্ছল বা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি জনাব আশরাফের মত। মাইজদী পাবলিক কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের সাথে যোগ দিয়ে তিনি তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দরখাস্ত ও রেজুলেশন লেখায় বেশ সাহায্য সহযোগিতা করলেও শেষ পর্যন্ত তা কোন কাজে আসেনি বা তার তেমন কোন বিশেষ ক্ষতি হয়নি, শুধু কলেজ ত্যাগ করেছেন মাত্র।

//////////////////////////

মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রতিষ্ঠার সময়ে একজন প্রধান শিক্ষকের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত

গ্রামের রাজনীতির কুফল এবং পরিণাম সম্পর্কে অনেকেরই অভিজ্ঞতা বা জানা আছে। জনাব আশরাফের প্রবাসে প্রতিষ্ঠা লাভের পর এখন তার এলাকার ভিলেজ পলিটিক্স সম্পর্কে লিখতে ইচ্ছে হলো। তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ঘটনাগুলো পাঠক এবং নতুন প্রজন্মকে সজাগ করবে বা সাবধান করবে এমন আশা করি এবং তাহলে লেখার সার্থকতা হবে বলে আমার বিশ্বাস্ এতে বেশ খুশী হবো। এধরনের ঘটনা ও কাহিনী সত্যি দুঃখজনক, তার এলাকার হাইস্কলটি ১৯৭২-৭৩ সালের দিকে শুরু করা হয়। কিন্তু স্কুলটির সরকারী অনুমোদন বা রেজিষ্ট্রেশন ও লাভ করেনি। তবে স্কুলের জন্য গম বরাদ্দ বা শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য রেশন বরাদ্দ ছিল। এতে মূলত এক ব্যক্তি লাভবান হয়েছিলেন। তিনি বিএসসি পাশ হিসাবে পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠিত ও নামকরা হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আর এখানে নতুন একটি জুনিয়র হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। জনাব আশরাফ সরাসরি তার ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ঐ স্কুলের ছাত্র ছিলেন বলে তার সাথে আশরাফের ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক ছিল বা তিনি ছাত্র মনে করতেন।

১৯৭৪ সালে দিকে একবার ঐ স্কুলের তদন্ত আসার পূর্বাদিন রাতে স্কুলের অফিস কক্ষের কাগজপত্র চুরির ঘটনা ঘটে। সেটা সম্ভবত তদন্ত থেকে মুক্তি লাভ বা কোনরূপ ষড়যন্ত্রের জন্য ঘটানো হয়ে থাকতে পারে। তার বাবা গ্রাম্য রাজনীতির সাথে জড়িত থাকায় ঐ ঘটনার তাদের গ্রামের বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয় তদন্তের জন্য ঐ স্কুলের কাগজপত্রের সন্ধানে। সেটা তার মনে দাগ কাটে। সেজন্য ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে তিনি ঐ স্কুলে ভর্তি হননি। তাছাড়া নামকরা ও প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ছাত্র হবার জন্য স্থানীয় নতুন স্কুলে ভর্তি না হয়ে দূরবর্তী ঐ হাইস্কুলে ভর্তি হন। সে সময় তার সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে অনেকেই বহু মন্তব্য ও সমালোচনা করে। ঐ স্কুলের তখন অনুমোদন বা স্বীকৃতি ছিল না।

১৯৮৪ সালে প্রায় দশ বছর পর তার ভূমিকা ও অবদানের কারণে তার বাবাকে ঐ হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সহসভাপতি করে থানা উন্নয়ন কর্মকর্তাকে সভাপতি পদাধিকার বলে সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে, বানিয়ে কমিটি করা হয়। কারন তার দ্বারা ঐ হাইস্কুলটি প্রথম বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারী ভাতা লাভ করে অর্থাৎ এমিপওভূক্ত হয়। ইতিপূর্বে স্কুলটির রেজিষ্ট্রেশন পর্যন্ত ছিল না। তার বাবার হাতেই ঐ ব্যক্তি প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং তিনি ঢাকা থেকে ঐ স্কুলের ছাত্র ছাত্রী ভর্তির পোস্টার ছাপিয়ে দেন। তাতে তার বাবার নাম সহসভাপতি ম্যানেজিং কমিটি এবং ঐ ব্যক্তির নাম প্রধান শিক্ষক লেখা ছিল। তখন তিনি চাকুরীর প্রয়োজনে খুব ভাল ব্যবহার করেন।

অকৃতজ্ঞ ও সুচতুর সেই প্রধান শিক্ষক সাহেব এক বছরের মাথায় কমিটির মেয়াদ শেষে তাঁর মনমত এডহক কমিটি গঠন করেন এবং তার বাবাকে কমিটি থেকে বাদ দেন। কিন্তু আশরাফ স্কুলের সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখেন। শিক্ষা বিভাগের সাথে তার সম্পর্ক থাকায় স্কুলের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করেন এবং স্কুলের উন্নয়নে তার অনেক ভূমিকা ও অবদান থাকায় আরও প্রায় দশ বছর পর ১৯৯৪ সালে তাকে স্কুলের কমিটিতে বোর্ড কর্তৃক মনোনীত শিক্ষানুরাগী সদস্য করা হয়। তখন সভাপতি ছিলেন থাকা নির্বাহী কর্মকর্তা পদাধিকার বলে। তিনিও কমিটিতে বেশ সক্রিয় হন।

তার সক্রিয় ভূমিকা ও অবদানের কারণে স্কুলের পরবর্তী নিয়মিত কমিটিতে দাতা সদস্য পদে নির্বাচিত করে কমিটির সভাপতি মনোনয়ন করা হয় এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়। সভাপতি হিসাবে প্রথম বছর তিনি বহু কষ্ট ও পরিশ্রম করেছেন স্কুলের উন্নয়নের জন্য। এত অল্প বয়সে একটা হাই স্কুলের সভাপতি হওয়া অনেকের দৃষ্টিতে ঠিক হয়নি। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি প্রিন্সিপাল পদবী ও এডভোকেট শব্দটি নামের সাথে ব্যবহার করার সুযোগ পান। তার যোগ্যতা ও কর্মের ব্যাপারে কারো অভিযোগ ছিল না। কিন্তু তিনি গ্রাম্য রাজনীতির হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার শিকার হয়। দেশের রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রধান শিক্ষকের সাথে তার বিভিন্ন মনোমালিন্য বা বিরোধিতা শুরু হয়। প্রধান শিক্ষকের অসযোগিতা ও বিভিন্ন অপতৎপরতার কারণে তিনি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তিনি সভাপতি হিসেবে স্কুলের জন্য বহু কাজ করেছিলেন।

তার স্বাক্ষর জাল করে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন এবং বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ বা অনুদান আত্মসাতের সুযোগ না পেয়ে প্রধান শিক্ষক উল্টো তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত শুরু করেন। কিছু স্থানীয় সরকারী দলের তৎকালীন নেতার ইন্দনে প্রধান শিক্ষক আমার বিরুদ্ধে স্কুলের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ দায়ের শুরু করেন। রাজনৈতিক কারণে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত বিশ হাজার টাকায় একজন সহকারী শিক্ষক ও কমিটির সহসভাপতির তথ্যাবধানে স্কুলের বারান্দা নির্মাণ করার পরও দুর্নীতি দমন বিভাগে মামলা দায়ের হয়। প্রধান শিক্ষক উক্ত টাকা আত্মসাতের কোন

সুযোগ পাননি। এতে তিনি স্থানীয় সংসদ সদস্য ও তার বিরুদ্ধে উক্ত টাকা আত্মসাতের ঘটনায় তথাকথিত দুর্নীতি দমন মামলার আশ্রয় নেন।

তিনি দেশ ত্যাগ করে বিদেশে প্রবাসী থাকায় তার বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতি মামলার কোন কাজ হয়নি। স্থানীয় সংসদ সদস্য হাইকোর্ট থেকে উক্ত মামলার আগাম জামিন নেন। দেশে থাকলে তিনিও তা পেতেন। কারণ তিনি প্রিন্সিপাল ও এডভোকেট ছিলেন প্রধান শিক্ষকের এহেন আচরণ ও মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার পরিণাম ভাল হয়নি। জনাব আশরাফ সভাপতি পদে থাকাকালীন স্কুলের যেসব উন্নতি ও উন্নয়ন করেছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেটার স্বাক্ষী স্কুলের শিক্ষক কর্মচারী ও এলাকাবাসী। কিন্তু তার পরবর্তীতে কোন কমিটি সে অনুযায়ী উন্নতি বা উন্নয়ন করতে পেরেছে কিনা তার জানা নেই।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক সাহেব কমিটির সাথে দ্বন্দ্ব ও মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন ও সাময়িক বরখাস্তের শিকার হন অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে। জনাব আশরাফের সময়ে বোর্ড থেকে রেজিষ্ট্রেশন জালিয়াতিতে প্রধান শিক্ষকের সরকারী বেতন ভাতা স্থগিত থাকায় তিনি ঋণ প্রদান করে সহযোগিতা করেন এবং সেই অভিযোগ থেকে তাকে অব্যাহতি লাভে সুপারিশ ও তদ্বীর করে বোর্ড থেকে বলার পরও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি। ইচ্ছা করলে বহিষ্কার ও চাকুরীচ্যুতি করতে পারতেন। ব্যাংকে স্বাক্ষর জালের অভিযোগে জেলে পাঠাতে পারতেন। কিন্তু ক্ষমা করে দিয়েছেন। অকৃতজ্ঞ প্রধান শিক্ষক সেটা স্মরণ না করে তাকে দুর্নীতির মামলায় জড়িত করেন। সেই মামলা এখন ডাষ্টবিনে সত্যের জয় অবিসাম্ভাবী মিথ্যা পরাজিত হতে বাধ্য। অথচ উক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল।

উক্ত সুচতুর ও দুর্নীতিবাজ প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন যাবত চাকুরীচ্যুত ও সরকারী বেতন ভাতা থেকে বঞ্চিত এবং আর্থিক অনটনে বিপর্যস্ত হয়ে হাইকোর্টের রায় নিয়ে চাকুরিতে যোগদানের পর বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। আর জনাব আশরাফ আল্লাহর রহমতে প্রবাসে প্রতিষ্ঠিত। উক্ত প্রধান শিক্ষক বি, এড ডিগ্রীর অধিকারী। আর জনাব আশরাফ বিদেশে এমএড করেছেন । এখন প্রয়োজনীয় অনুদান দিয়ে নিজ নামে নতুন একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। আল্লাহ তাকে সে সামর্থ্য দিয়েছেন। আর প্রধান শিক্ষককে তার কৃতকর্ম ও আচরণের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন। গ্রাম্য রাজনীতিতে এটা একটা বাস্তব ও সত্য দৃষ্টান্ত। তিনি সুযোগ ও ক্ষমতা থাকা সত্যেও তাঁর ৮ জন ছেলেমেয়ে ও পরিবারের কথা চিন্তা করে তাঁকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেননি বরং তাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন। অথচ ৪ প্রধান শিক্ষক তার মাইজদী পাবলিক কলেজের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে বেশ সক্রিয় ছিলেন, যদিও তার তেমন কোন ক্ষতি করতে পারেননি।

//////////////////////////

মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রয়োজনে অভিমান ভেঙ্গে জনাব আশরাফ মেজর মান্নান সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন

মেজর (অব:) আবদুল মান্নান সাহেব তখন বাংলাদে সরকারের প্রতিমন্ত্রী এবং নোয়াখালী জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সে হিসেবে নোয়াখালীর উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সভায় মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতেন। স্থানীয়ভাবে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও ঢাকা থেকে এমপি নির্বাচিত হবার কারণে তিনি স্থানীয় সংসদ সদস্যের সাথে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্বে জড়িত ছিলেন না। জনাব আশরাফের সাথে রাজনীতিতে যোগদানের পূর্বে স্থানীয়ভাবে নোয়াখালীতে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে মেজর মান্নান ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠায় কারণে সম্পর্কও যোগাযোগ ছিল। সে সময় ছাত্রজীবন ও যৌবনের মূল্যবান প্রায় ৩ বছর নষ্ট করেন মেজর মান্নান সাহেবের পেছনে। তিনি সমাজসেবা থেকে রাজনীতি এবং মন্ত্রীত্ব লাভ করেছেন। আর জনাব আশরাফ তার মন্ত্রীত্বের আমলে অবহেলা ও বিদ্রুপের শিকার হয়নি। অবশেষে মন্ত্রীত্বের শেষ বছরে মাইজদী পাবলিক কলেজের বিভিন্ন দরখাস্তের সুপারিশ ও ডিও লেটারের জন্য তাঁর অফিস সচিবালয়ে এবং মন্ত্রীপাড়ার বাসভবনে ৪/৫ বার যেতে হয়েছে। মাইজদী পাবলিক কলেজ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা প্রয়োজনে তাঁর শরণাপন্ন হতে দরকার ছিলনা। মেজর মান্নান ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং এক সময় মেজর মান্নান সাহেবের খুব ঘনিষ্ট ও সম্পর্কিত ছিলাম। ১৯৯৮ সালের দিকে মেজর মান্নান সাহেব এলাকায় কিছু সমাজসেবা ও জনকল্যাণের ব্রত নিয়ে মেজর মান্নান ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। মরহুম ওলেমান চেয়ারম্যান, মরহুম হানিফ চেয়ারম্যান, মরহুম খলিল মিয়া এবং মনির চেয়ারম্যান সাহেবসহ৯ বেশ কিছু ব্যক্তি মেজর মান্নান সাহেবের

সাথে জনাব আশরাফকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং সমাজ সেবামূলক কাজে সহযোগতা করার কথা বলেন। তখন সাহেবের হাট এলাকার আবু মিয়া সাহেব চৌরাস্তা বাজারকে এক সভায় (দাখিল/এবতেদায়ী মাদ্রাসায়) "মান্নান নগর" ঘোষণার প্রস্তাব দেন এবং মেজর মান্নান ফাউন্ডেশন গঠন করার জন্য সেই সভায় অনুরোধ জানানো হয়। পরে চট্টগ্রামে মেজর মান্নান সাহেবের বাসায় ও অফিসে যোগাযোগ ও যাতায়াত করা শুরু করেন জনাব আশরাফ।

তখন মেজর মান্নান সাহেব ব্যবসায়িকভাবে খুব ব্যস্ত থাকতেন। জনাব আশরাফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স শেষ করে এম কম পড়তেন। এলাকার বিভিন্ সংস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেজর মান্নান সাহেবকে দাওয়াত দিতে শুরু করে এবং তিনিও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। উনার সমাজসেবা ও জন কল্যাণের সকল কর্মকান্ড মেজর মান্নান ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়। ফাউন্ডেশনের গঠনতন্ত্র তৈরি ও কমিটি গঠনের প্রায় একবছর লেগে যায়। প্রথম কমিটিতে জনাব আশরাফ অনিচ্ছা সত্বেও মেজর মান্নান সাহেব সাধারণ সম্পাদক পদে জনাব আশরাফের নাম প্রস্তাব করেছিলেন ও গঠনতন্ত্র ছাপানোর জন্য খসড়া/গ্রুপ উনাকে দেয়া হয়। তিনি অন্যের নাম কেটে তাঁর নাম বসান, যদিও কমিটির তালিকায় সর্বশেষ তাঁর নাম ছাপিয়েছিলেন। তখন থেকে তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন এবং গঠনতন্ত্র প্রণয়ন সভা আহ্বান, রেজুলেশন লেখা, ব্যাংক একাউন্ট করা ও এফডিআর করাসহ প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি তখন ২টি পত্রিকার সম্পাদক (মাসিক নোয়াখালী দর্পণ ও সাপ্তাহিক নোয়াখালী বার্তা) ও বিভিন্নভাবে সাংবাদিকতার সাথে বেশ জড়িত থাকার কারণে পত্র-পত্রিকায় মেজর মান্নান ফাউন্ডেশনের ব্যাপক প্রচার ও প্রচারণা লাভ করে। মেজর মান্নান সাহেবের ছবি ও কর্মকান্ড, প্রতিবেদন বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত শুরু করে। এমনকি মেজর মান্নান সাহেবের সাথে তাঁর সম্পর্ক নষ্ট করার অপপ্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত চারিত্রিক গুনাবলী ও শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে তারা সফল হয়নি বরং মেজর মান্নান সাহেবের সাথে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। মেজর মান্নান সাহেব তাঁর সুপারিশ বা অনুরোধ উপেক্ষা করতে বা তাঁর বিরুদ্ধে কিছু শুনতেও পারতেন না।

১৯৮৯ সালে জনাব আশরাফ এমকম সম্পন্ন করে। কিন্তু ফাস্ট ক্লাশ থাকলেও (এসএসসি এবং এইচএসসির মেধা তালিকায় স্থান থাকার কারণে) তা না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন এবং এলএলবি ডিগ্রী লাভের জন্য সচেষট হই। এলএলবিতে তিনি ২য় শ্রেণী লাভ করেন যা সচরাচর সম্ভব হতো না। এলএলবি পাশের পর লন্ডনে গিয়ে বার এট ল করার জন্য বিদেশে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে মেজর মান্নান সাহেবের সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে যৌবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করেন, তখন তার চট্টগ্রাম অফিসে কর্মরত কমার্স কলেজের কিছু ছাত্র (যারা তাঁকে কমার্স কলেজ থেকে বোর্ডের মেধা তালিকায় ২য় স্থান পাবার কারণে চিনতেন) তাঁকে তাঁদের এমডি সাহেবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে খুশি হতেন। অনেকেই তাঁকে তার কোম্পানীতে চাকুরী করার জন্য বলতেন। কিন্তু লন্ডনে যাবার সুযোগের আশায় তিনি চাকুরীর চিন্তা করেনি। মেজর মান্নান ফাউন্ডেশন গঠনসহ নোয়াখালীতে মেজর মান্নান সাহেবের বিভিন্ন এলাকায় ও প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে যোগদানের তারিখ ও সময় নির্ধারণ এবং অনুদান প্রদানের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকেন। মন্ত্রীর সফর বা বিশিষ্ট ব্যক্তির সফর সূচীর মত মেজর মান্নান সাহেবের নোয়াখালীতে সফর সূচী তৈনি করেন। একদিনে ৪/৫টি অনুষ্ঠানের সময়সূচি নির্ধারণ ও সমন্বয় করেন বিষয়টি ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) এর কাজ হলেও মেজর মান্নান ফাউন্ডেশনের নামে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তা করতেন। ফাউন্ডেশনে তিনি বেতনভুক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী ছিলেননা। (যা অনেকের মনে হতো) মেজর মান্নান সাহেব যাকে খরচের কিছু টাকা দিতেন। তাঁর কিন্তু টাকা পয়সার চেয়ে তার সান্নিধ্য লাভ ও সুদৃষ্টি কামনা ছিল মুখ্য বিষয়। কারণ লন্ডনে গিয়ে বার এট ল করতে তার সহযোগিতা প্রয়োজন। সেজন্য তিনি তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন।

১৯৯০ সালে মেজর মান্নান ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এককালীন ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান করে। যাতে জেলা প্রশাসক সাহেব ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে মেজর মান্নান ট্রাষ্ট গঠনের উদ্যোগ এবং মান্নান নগর বাজার উদ্বোধন করা হয় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা চেয়ারম্যান দ্বারা। মান্নান নগর নামে ডাকঘর স্থাপনের ব্যবস্থা শুরু। মেজর মান্নান জুনিয়র হাই স্কুল করার জন্য জনাব আশরাফের নামে অবৈতনিক প্রধান শিক্ষক ও জনাব রুহুল আমিনকে সহসভাপতি (মেজর মান্নান সাহেবকে সভাপতি) করে কমিটি গঠন ও সাহেবের হাট অগ্রণী ব্যাংকে একাউন্ট করে ব্যাংক থেকে শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন প্রদানের ব্যবস্থা হয়। আজ সেই স্কুল কলেজে উন্নীত হয়েছে। এইসব কিছু করতে ২/৩ বছর সময় কেটে যায় এবং এরশাদ সরকারের পরিবর্তনের পর মেজর মান্নান বিএনপিতে যোগদানকরেন।

মেজর মান্নান ফাউন্ডেশন গঠন ও কার্যক্রম পরিচালনার সময় মেজর মান্নান সাহেব কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা আকাংখা জনাব আশরাফের জানা ছিলনা বা তিনি হঠাৎ বিএনপিতে যোগ দেয়ায় হতাশ হয়ে পড়েন। তখন তার স্থানীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীতা পদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। নোয়াখালীতে কিছু লোক ও বিএনপি কর্মী মেজর মান্নান সাহেবের দালাল বলে অপমান ও অপদস্ত করতে চেষ্টা করে।

তখন ঢাকায় গিয়ে উনার অফিসে যোগাযোগ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও কর্মকান্ড সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকেন ইতিমধ্যে কিছু রাজনৈতিক নেতা কর্ম যারা নোয়াখালীতে অপ্রিয় ছিলেন তারা উনার আশে পাশে জড় হন। শুরু হয় শাহজাহান-মান্নান গ্রুপ। তিনি নিরাপদ দূরত্বের থাকার চেষ্টা করেন তখন নোয়াখালীর বিএনপিতে কোন্দল ও গ্রুপিং চলে। অবশেষে মেজর মান্নান সাহেব নোয়াখালীতে নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর এবং জনাব শাহজাহানের পক্ষে নির্বাচন করার ঘোষণা দেয়ায় পরিস্থিতি শান্ত হয়। পরে তিনি ঢাকা থেকে নির্বাচন করেন। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করা (এসএম হলের ভোটার) ছাত্র এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে তাঁর একটা ব্যবসায়িক অফিসে জনাব আশরাফ। যাতায়াত থাকায় পত্রপত্রিকায় মেজর মান্নান সাহেবের পরিচিতি, সাক্ষাতকার, প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ ও ছাপানোর দায়িত্ব জনাব আশরাফ। বিএনপি সদস্য না হওয়া বা অরাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে বেশ সফলতার সাথে মেজর মান্নান সাহেবের (লেটার হেড ও সীল বানিয়ে) গণসংযোগ কর্মকর্তা (পিআরও) হিসেবে কাজ করেন। তৎকালীন বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার পর মেজর মান্নান সাহেব ঢাকার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কভারেজ পেয়েছিলেন। যার একক কৃতিত্ব, ভূমিকা ও অবদানের দাবী তিনি করতে পারেন। তখন দৈনিক এক হাজার টাকা খরচ দেয়া হতো। বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা ও নোয়াখালীর অনেক বিএনপি, যুবদলের ও ছাত্রদরের নেতা ও কর্মীরা হিংসার কবলে পড়তে হয়। কিন্তু মেজর মান্নান সাহেব ভাল জানতেন বলে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পন্ন ও দায়িত্ব পালন করেন নির্বাচনে তিনি শেখ হাসিনাকে হারিয়ে জয়লাভ করেন। তখন মান্নান সাহেবের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং মন্ত্রীত্ব লাভের পর তা স্থায়ী রূপ লাভ করে। উনার মন্ত্রীর অফিস বা বাসায় তাই যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। উনার ব্যবসায়িক ঢাকা ও চট্টগ্রামের অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী থেকে শুরু করে ঢাকা নোয়াখালীর অনেক লোক আশ্চর্য হন। পরে সে ল' পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন মন্ত্রীত্বের আমলে তিনি অবহেলা ও বিদ্রুপের শিকার হন। প্রায় ৪ বছর অভিমানে তাঁর মন্ত্রীর বাস ভবন বা দপ্তরে যাননি। প্রথম দিকে তার নোয়াখালী সফরের সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেও তার সাথে পূর্বের ঘনিষ্ঠতা ও পরিচিতির পার্থক্য লক্ষ্য করেন। তিনি যেন তাঁকে এড়িয়ে চলেন। তার পর মেজর মান্নান ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দেয়। তাঁর নামে স্কুল, মাদ্রাসা, বাজার, ডাকঘর ট্রাষ্ট ইত্যাদির ব্যাপারেও জনাব আশরাফের প্রয়োজনীয়তা পূরণ বা শেষ চিন্তা করে তিনিও কেটে পড়ার চিন্তা করেন। অবশ্য মন্ত্রীর চামচা না হয়ে তিনি ভাল করেছেন। পরে প্রিন্সিপাল ও এডভোকেট হয়েছেন এবং মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হতে পেরেছিলেন। তবে মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রয়োজনে আবার তার মন্ত্রীত্বের শেষ বছরে মন্ত্রী পাড়ার বাসভবনে ও সচিবালয়ের দপ্তরে কয়েকবার যাতায়াত করতে হয়েছিল।

////////////////////

মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার কাহিনী লিখতে অনেকেরই অনুরোধ এবং প্রতিষ্ঠার কথা বর্তমানে অনেকের অজানা থাকতে পারে কিংবা অনেকে ভুলে যেতে পারেন কিংবা ভূয়া প্রতিষ্ঠাতা দাবী কেউ করতে পারেন অথবা প্রকৃত প্রতিষ্ঠার কাহিনী চাপা পড়তে পারে এই আশংকায় তা লিখা প্রয়োজন। আজ যারা কলেজের বর্তমানঅবস্থা দেখছেন বা বর্তমান চিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের কলেজের সেই প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে কথা চিন্তা করার বিষয়ে এ লেখা কাজে লাগবে। তাই কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো, যা ১০০% সত্য ঘটনা।

১। প্রয়োজনীয়তা ও শুরুর কথা : নোয়াখালী জেলা শহর মাইজদীতে একটি বেসরকারী কলেজের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নোয়াখালী কলেজ সরকারীকরণের পরপরই। নোয়াখালী জেলা শহরে একটি মাত্র কলেজ, তাও সরকারী। অথচ অন্যান্য জেলা শহরে সরকারী কলেজের পাশাপাশি একাধিক বেসরকারী কলেজ রয়েছে। জেলা শহরের পূর্বে কবিরহাট কলেজ ও পশ্চিমে বাঁধেরহাট আবদুল মালেক কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে জেলা শহরের দক্ষিণাংশে সোনাপুর কলেজ ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মাইজদীতে একটি মহিলা কলেজ (পরবর্তীতে সরকারী) এবং নোয়াখালী নৈশ কলেজ নামে একটি নামে মাত্র কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আশির দশকে দেশে কলেজ প্রতিষ্ঠা করার শর্ত সহজ ছিল না, এমপিওভুক্তিরও সুযোগ কম ছিল। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সারাদেশে বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে। কলেজ প্রতিষ্ঠার শর্ত শিথিল ও সুযোগ থাকায় চরজব্বর কলেজ, সৈকত কলেজ, ভুলুয়া কলেজ, চাপরাশির হাট হাই স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নোয়াখালী সদর মাইজদীতে একটি বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসন বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি বা চিন্তা করেননি। সম্মিলিত প্রচেষ্টার বা উদ্যোগেরও অভাব ছিল। ব্যক্তিগত উদ্যোগও তেমন লক্ষ্য করা যায়নি।

১৯৯৪ সালে নোয়াখালী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বন্ধের (দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মত) শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি সার্কুলার আসে। কিন্তু নোয়াখালী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

কর্তৃপক্ষ চালু রাখেন। তখন মাইজদীতে একটি বেসরকারী কলেজ বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু কোন দানশীল ব্যক্তি বা সংস্থা কিংবা রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা ব্যক্তিত্ব থেকে এরূপ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বরং অনেকের কাছে এটা একটা অসম্ভব এবং অকল্পনীয় কাজ বলে মন্তব্য ও মনে করা হয়। প্রথমদিকে অনেকেই সাহায্য সহযোগিতা করতে রাজী হননি বা করেননি। জনাব আশরাফুল করিম অর্থ সংগ্রহ, তহবিল গঠন, কলেজ গৃহ নির্মাণ এবং কলেজের অনুমোদন লাভের বিষয়টি সহজ ও সুলভ ছিলনা, এমনকি কল্পনার বাইরে ছিল।

উক্ত বছরই নোয়াখালী জেলা শহর মাইজদীতে একটি বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন চরবাটা সৈকত কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ আশরাফুল কমির এডভোকেট। তবে কলেজটি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে তিনি বহু ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মোকাবিলা করেন। তার বিরুদ্ধে স্বনামে-বেনামে বহু দরখাস্ত বিভিন্ন দপ্তরে জমা হয়। ব্যক্তিগত জীবনে মেধাবী ও কৃতিছাত্র এবং সাংবাদিক ও লেখক হবার কারণে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা তিনি কলেজটির প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হন। কিন্তু কলেজটি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন লাভের পর কলেজের জমির ব্যবস্থা, কলেজ ভবনের গৃহনির্মাণ ও প্রয়োজনীয় তহবিল সৃষ্টির পর স্বার্থান্বেষী ও কুচক্রীমহলের প্ররোচনা কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের মাধ্যমে তাকে কলেজ থেকে দূরে সরানোর জন্য তাই বর্তমানে তিনি সুদুর আফ্রিকা মহাদেশের বোতসোয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এড কোর্সে অধ্যয়নরত ও প্রবাসী। সেখানে তিনি সস্ত্রীক ব্যবসায়িকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নিজ নামে অনুদান দিয়ে একটি বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে সক্ষম।

২। নামকরণ : নোয়াখালী পাবলিক কলেজ নামে ১৯৯৪ সালে একটি নতুন বেসরকারী কলেজ শুরু করার জন্য প্রচারপত্র, প্রকাশনা, ব্যানার, পোস্টার এসএসসির পরীক্ষার সময়সূচী এবং পত্রপত্রিকায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও সংবাদ প্রকাশ ও প্রচারণা শুরু হলে উক্ত নামের ব্যবহার না করার অনুরোধ ও পরামর্শে বিকল্প নাম ব্যবহার করার চিন্তা ভাবনা করা হয়। বেগমগঞ্জের চৌরাস্তায় নোয়াখালী পাবলিক স্কুলকে তখন কলেজে উন্নীত করার পরিকল্পনা থাকায় নোয়াখালী পাবলিক কলেজ নাম বাদ দেয়া হয়। যদিও কুমিল্লা বোর্ডে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম অনুমতির সেই দরখাস্তে নোয়াখালী পাবলিক কলেজ নামটি ছিল। নোয়াখালীর কৃতিসন্তান উক্ত নোয়াখালী পাবলিক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক সচিব জনাম মোঃ ফয়েজ উল্যাহ উক্ত নামে আরেকটি নতুন কলেজ শুরু না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বোর্ড থেকেও নতুন একটি কলেজ চালু না করে মৃতপ্রায় নোয়াখালী নৈশ কলেজকে নতুন উদ্যোগে নোয়াখালী দিবা ও নৈশ কলেজ নামে কলেজ চালুর প্রস্তাব ও পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু নৈশ কলেজের তৎকালীন কর্তৃপক্ষ তাতে রাজী হননি কিংবা সেটা সম্ভব হয়নি।

নোয়াখালী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রথম বলে জানা যায়। কিন্তু নতুন কলেজের মাইজদী মানটি পরিত্যক্ত হয়। এ কলেজের পুরাতন ভবন ও জমি নতুন কলেজের জন্য বরাদ্দের আশায় মাইজদীর নামে কলেজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা করা হয়। সোনাপুরের কলেজের নাম 'সোনাপুর কলেজ' আর মাইজদীতে কলেজ করলে 'মাইজদী কলেজ' নামকরণ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করা হয়। তখন বেশ কয়েকটি বেসরকারী কলেজের নামের মধ্যে পাবলিক শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন, ফেনী পাবলিক কলেজ সে সময় চালু হয়। ফলে মাইজদী পাবলিক কলেজ নাম চূড়ান্ত করা হয়। যদিও নোয়াখালী পৌরসভার আর্থিক সাহায্যে নোয়াখালী পৌর কলেজ, নোয়াখালী শহর নদী গর্ভে বিলীন হবার পর নোয়াখালী শহরের নাম বিলুপ্তির কারণে স্মরণীয় রাখার জন্য নোয়াখালী সিটি কলেজ নামকরণের প্রস্তাব এসেছিল। শেষ পর্যন্ত মাইজদী পাবলিক কলেজ নামকরন করা হয়।

৩। প্রচার ও প্রকাশনা : মাইজদী পাবলিক কলেজের মত কোন কলেজের প্রতিষ্ঠার শুরুতে এত বেশী প্রচার ও প্রকাশনার দৃষ্টান্ত নেই। এসএসসি পরীক্ষার সময়সূচী প্রকাশ ও বিতরণ, পোষ্টার, হ্যান্ডবিল, ব্যানার ব্যাপকভাবে দেখা যায়। এতে অনেকেই বিরূপ মন্তব্য করেন। কারণ কলেজের বাস্তব অবয়ব তেমন ছিল না, তখন কেউ কেউ প্রতিষ্ঠার ও অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও মন্তব্য করতে দ্বিধাবোধ করেননি। অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেন নি যে, এরূপ একটি কলেজ করা যাবে বা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। কারণ কলেজের জন্য জমি কোথায় পাওয়া যাবে, গৃহ নির্মাণের টাকা কে দিবে। আসবাবপত্র কিভাবে হবে? তহবিলের জোগাড় কিভাবে হবে, কে করবে? কিভাবে ও কখন কলেজ চালু হবে এবং কলেজের অনুমোদন পাওয়া যাবে কিনা এসব ছিল বিরাট প্রশ্ন। কিন্তু এসব সত্বেও কলেজের ব্যাপক প্রচারণা ও প্রকাশনা অব্যাহত থাকে। ১৯৯৫ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠার ২য় বছরে নোয়াখালী পৌরসভার সৌজন্যে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষের আবেদন ও অনুরোধে পাঁচ হাজার পোস্টার ও বিশ হাজার হ্যান্ডবিল প্রকাশ করা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির জন্য। এছাড়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত উদ্যোগে বহু পোস্টার ও ব্যানার লাগানো হয়। এসবের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করেন তিনি এককভাবে তখনকার কলেজ সম্পর্কিত প্রচার ও প্রকাশনা ছিল লক্ষণীয়। এতে সমালোচনাকারীরা চুপ হয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকা বিশেষ করে দৈনিক জাতীয় নিশান পত্রিকার ভূমিকা প্রশংসনীয়। তারা কলেজ সম্পর্কে বহু প্রতিবেদন ও সংবাদ প্রকাশ করেন।

৪। কলেজের জমি সংগ্রহ ও গৃহ নির্মাণ : মাইজদী পাবলিক কলেজের নিজস্ব জমি না থাকায় শহরে জমির খুব দুষ্পাপ্যতার কারণে কলেজের কার্যক্রম সাময়িকভাবে চালু করার জন্য জেলা প্রশাসক বরাবরে মাইজদী শহরের গণপুর্ত বিভাগের একটি পরিত্যক্ত ভবন বা ঘর, নোয়াখালী আইন কলেজ (দিনের বেলায় কার্যক্রম না থাকায়) ভবন, প্রভাতী শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (মর্নিং শিপ্টে চালু থাকায়) ব্যবহার করার অনুমতির জন্য দরখাস্ত করেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ আশরাফুল করিম এডভোকেট। কিন্তু বহু চেষ্টা তদ্বীর করার পরও সেটা পাওয়া যায়নি। কোন সাড়া বা সাহায্য সহযোগিতা সম্ভব না হলেও নানা বাধাবিপত্তি প্রতিবাদ ও সমস্যা দেখা দেয়। ঐ সময় নোয়াখালীর বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব মোঃ আনোয়ারকে মির্জা কলেজের সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি মনোনয়ন করা হয়। তিনি অরুণ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্যকরী কমিটির সভাপতি ছিলেন। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ জনাম মুহাম্মদ আশরাফুল করিম এডভোকেট উক্ত কলেজের কার্যক্রম অস্থায়ীভাবে অরুণ চন্দ্র হাইস্কুলে চালুর আবেদন করেন। কিন্তু স্কুলের কমিটির সভায় তা অনুমোদিত হয়নি। পরে এ এ ছাত্তার উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি সে অনুমোদন দিলে সেখানে কলেজের সাইনবোর্ড লাগিয়ে অস্থায়ীভাবে কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ আশরাফুল করিম এডভোকেট তার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ভূমিকায় কলেজের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। কিন্তু বোর্ড সে বছর কলেজ চালুর অনুমোদন দেয়নি। ফলে হতাশা দেখা দেয়, অতঃপর আল-ফারুক একাডেমী সংলগ্ন স্থানে স্কুলের প্রাক্তন পরিত্যক্ত ঘর, বাড়ির মালিক থেকে ভাড়া নিয়ে সেখানে কলেজের কার্যক্রম স্থানান্তর করা হয়। আল-ফারুক একাডেমী সংলগ্ন গণপুর্ত বিভাগের খালি অব্যবহৃত জমিতে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয় এবং সেই জমির জন্য চেষ্টা তদ্বীর শুরু হয়। তখন নোয়াখালী জেলা সদর মাইজদী শহরে গণপুর্ত বিভাগের অব্যবহৃত জমি ব্যবহারের মাস্টার প্ল্যান তৈরির জন্য ঢাকা থেকে আসা প্রতিনিধি দল সরেজমিনে পরির্দশন ও পরবর্তীতে নক্সা প্রণয়নের সময় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ আশরাফুর করিম এডভোকেটের আবেদনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ শাহজাহানের সহযোগিতায় কলেজের বর্তমান স্থানটি নির্ধারণ করা হয়। যা ঐ মাস্টার প্ল্যানে চিহ্নিত আছে। তৎকালীন নোয়াখালীর গণপুর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, কমিল্লার তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রামের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকার গণপুর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে উক্ত জমি কলেজের অনুকূলে বরাদ্দের প্রস্তাব ও সুপারিশ অনুমোদনের জন্য গণপুর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরে তৎকালীন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ শাহজাহানের সুপারিশক্রমে বরাদ্দকৃত গম দ্বারা উক্ত স্থানে মাটি ভরাট করা হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ আশরাফুল করিম কলেজের জন্য উক্ত স্থানে গৃহ নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন এবং প্রথম কলেজ ভবন নির্মিত হয় টিনের ছাউনি টিনের বেড়া দ্বারা। উক্ত কলেজ গৃহের জন্য জনাব মোঃ আনোয়ার মির্জা ত্রিশ হাজার টাকার ঢেউটিন ক্রয় করে দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষের বাকীতে ও ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে কলেজের গৃহনির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। ১৯৯৭ সালে বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলাম কলেজের জন্য নতুন আরেকটি গৃহনির্মাণ করার লক্ষে বিভিন্ন কিস্তিতে মোট একলক্ষ টাকার অনুদান প্রদান করেন। মাননীয় সংসদ সদস্য সাবেক জনাব মোঃ শাহজাহানের সুপারিশ জেলা প্রশাককের নিকট থেকে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের একলক্ষ টাকার অনুদানের চেক পাওয়া যায়। সেই টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার ৫ বছর মেয়াদী এফডিআর (রিজার্ভ ফান্ড) করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তখন পঁচিশ হাজার টাকার অনুদান পাওয়া যায়। এসব টাকা কলেজের গৃহনির্মাণে ব্যয় করা হয়।

৫। আসবাবপত্র : কলেজ চালুর সময় কলেজের অধ্যক্ষের কার্যালয়ে ব্যবহৃত চেয়ার টেবিল প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ আশরাফুল করিম এডভোকেটের ব্যক্তিগত লচেম্বারের জন্য তৈরী। নোয়াখালীর কৃতি সন্তান সাবেক প্রধান বিচারপতি (বর্তমানে মরহুম) জনাব বদরুল হায়দার চৌধুরী কর্তৃক চেশায়ার ফাউন্ডেশান নামক আন্তর্জাতিক এনজিও থেকে কিছু আসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল ও ব্যাঞ্চ) প্রদান করা হয়। কলেজ ভবন নির্মাণের পর হামদর্দ ও বায়তুশ সাইফ দরবার শরীফ থেকে কিছু সিলিংফ্যান, প্রদান করা হয়। এছাড়া ২টা আলমিরা ও ঘড়ি প্রদান করেন স্থানীয় শিক্ষানুরাগীবৃন্দ। প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কিছু আসবাবপত্র তৈরী ও ক্রয় করেন তাঁর ব্যক্তিগত ঋণে ও বাকীতে।

৬। অনুষ্ঠান ও সভাসমাবেশ : কলেজ প্রতিষ্ঠার পর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রধান এবং শিক্ষানুরাগীদের এক মত বিনিময় সভা জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্য তৎকালীন নোয়াখালী পৌরসভার চেয়ারম্যানসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কলেজ প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আশরাফুল করিম এডভোকেট। এতে সবাই কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষে মতাত প্রকাশ করেন।

কলেজের জন্য নির্ধারিত স্থানে কলেজের সাইনবোর্ড লাগানো এবং মাটি ভরাটের কাজ শুরু উপলক্ষে আল-ফারুক একাডেমীতে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অথিতি ছিলেন তৎকালীন মাননীয় সংসদ সদস্য মোঃ শাহজাহান, মিলাদ পরিচালনা করেন বায়তুশ সাইফ দরবার শরীফের পীর সাহেব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ সাইফুল

ইসলাম সিদ্দিকী। জেলা প্রশাসকসহ গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এতে বক্তৃতা করেন। সভা পরিচালনা করেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আশরাফুল করিম এডভোকেট। ১৯৯৬ সালে কলেজের জন্য নির্মিত ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক মিলাদ মাহফিল ও ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। এতে বায়তুশ সাইফ দরবার শরীফের পীর সাহেব এবং জেলা প্রশাসক উপস্থিত ছিলেন। কলেজের স্বীকৃতির জন্য তখন কুমিল্লা বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যানকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় এবং একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তৎকালীন মাননীয় বৃটিশ হাইকমিশনারের নোয়াখালী সফরের সময় মাইজদী পাবলিক কলেজের পক্ষ থেকে স্থানীয় ডানিডা সেন্টারে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলেজের সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ আনোয়ার মির্জা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী (বর্তমানে মরহুম) স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জেলা প্রশাসক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আশরাফুর করিম এডভোকেট।

৭। কমিটি সমূহ : কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরুতে ডাঃ একেএম আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সদস্য সচিব ছিলেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আশরাফুল করিম এডভোকেট। পরে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন মোঃ আনোয়ার মির্জা। কলেজের অনুমোদন পাবার পর বিধি মোতাবেক জেলা প্রশাসককে পদাধিকার বলে সভাপতি করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। উক্ত কমিটিতে জনাব মোঃ আনোয়ার মির্জা দাতা সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ছিলেন আলহাজ্ব মোঃ মাহফুজুর রহমান (অবসরপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার) আলহাজ্ব মহিউদ্দিন আহমেদ ইঞ্জিনিয়ার (বর্তমানে মরহুম) ডাঃ একেএম আনোয়ার হোসেন (বর্তমানে মরহুম) মঞ্জুরুল করিম (শিক্ষক) এবং সদস্য সচিব-পদাধিকার বলে অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আশরাফুল করিম এক বছর মেয়াদের জন্য তা গঠিত হয়। উক্ত কমিটির মেয়াদ শেষে প্রথমে জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে এবং পরবর্তীতে স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ শাহজাহানকে সভাপতি করে একটি এডহক কমিটি গঠিত হয় ও ৬ মাসের জন্য উক্ত এডহক কমিটি অনুমোদন লাভ করে।

৮। অনুমোদন ও স্বীকৃতি : ১৯৯৪ সালে উক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করলে ও ১৯৯৪-১৯৯৫ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তির অনুমতি পাওয়া যায়নি। পরবর্তী বছর, ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে মানবিক ও বাণিজ্য শাখায় ছাত্রছাত্রী ভর্তির অনুমতি পাওয়া যায়। ১৯৯৬ সালে দ্বাদশ শ্রেণী খোলার অনুমতিসহ প্রথম একাডেমীক স্বীকৃতি পাওয়া যায়। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ আশরাফুল করিমের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের পর ৩ বছর সাধনায় কলেজটির অনুমোদন ও স্বীকৃতি লাভ ঘটে। ১৯৯৮ সালে কলেজটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এমপিওভুক্ত হয়।

৯। অনুদান ও তহবিল : কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে প্রায় দুই বছর যাবত কলেজের জন্য সকল প্রকার ব্যয়ভার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে প্রদান করেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আশরাফুল করিম এডভোকেট। প্রথম দুই/তিন বছর চাঁদা বা অনুদানের জন্য কোন রশিদ ছাপানো হয়নি কিংবা চাঁদা বা অনুদান তোলা হয়নি। ১৯৯৬ সালের দিকে কলেজের সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি মোঃ আনোয়ার মির্জা দশ হাজার টাকার এককালিন নগদ অনুদান প্রদান করেন। কলেজ গৃহের জন্য মোঃ আনোয়ার মির্জার ঢেউটিন ক্রয়, আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলাম কর্তৃক ১৯৯৭ সালে বিভিন্ন কিস্তিতে এক লক্ষ টাকা দান, মাননীয় সাংসদ কর্তৃক সুপারিশকৃত তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের এক লক্ষ টাকার অনুদান যার পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে রিজার্ভ ফান্ডের জন্য এফডিআর করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পঁচিশ হাজার টাকা ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য কোন অনুদান পাওয়া যায়নি। স্থানীয়ভাবে কোন চাঁদা বা অনুদান তোলা হয়নি। কলেজ প্রতিষ্ঠার ৩ বছর পর কলেজের গৃহ নির্মাণ তহবিল সৃষ্টির লক্ষ্যে একশত টাকার কুপন ছাপানো হয়। কিন্তু তাতে তেমন আশানুরূপ সাড়া বা ফলাফল পাওয়া যায়নি। অন্যান্য কলেজের মত স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বা এলাকাবাসীর কোন দান বা অনুদান এই কলেজ লাভ করেনি। তবে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত তহবিল ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা শিক্ষক কর্মচারীদের থেকে কিছু ঋণ গ্রহণ করা হয় বা বাকীতে বিভিন্ন খরচ সম্পন্ন হয়।

১০। প্রতিষ্ঠাতা : মাইজদী পাবলিক কলেজের একক প্রতিষ্ঠাতার দাবীদার মুহাম্মদ আশরাফুল করিম এডভোকেট। তিনি অধুনালুপ্ত মাসিক নোয়াখালী দর্পণ ও সাপ্তাহিক নোয়াখালী বার্তা পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। তিনি চরবাটা সৈকত কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও মেজর মান্নান ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ছাত্রজীবনে মেধাবী ও কৃতি ছাত্র ছিলেন। তিনি কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা নোয়াখালী জিলা স্কুল থেকে বাণিজ্য বিভাগের মেধা তালিকায় একাদশ স্থান এবং এইচএসসি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগের মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

বর্তমানে জনাব আশরাফ সাউথ আফ্রিকায় প্রবাসী। সেখানে তিনি এমএড ডিগ্রি কোর্সে পড়াশোনাসহ বিজনেস এন্ড মার্কেটিং কনসালটেন্সি ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছেন।

////////////////////

মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এ লেখায় মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং প্রথম দিকে ঘটনাগুলোর বিবরণ পাওয়া যাবে। কলেজে কর্মরত বা চাকুরীপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের ভূমিকার কথা ও লেখায় প্রকাশ করিনি। কারণ তারা সুবিধাভোগী বা বেনিফিসিয়ারী কিন্তু অন্য যারা নিঃস্বার্থভাবে কলেজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য সহযোগিতা করেছেন বা ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন সঙ্গত কারণে তাদের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেছি। শিক্ষক কর্মচারীদের ভূমিকা ও অবদান সকলেরই কম বেশী জানা আছে। তাই এ লেখায় তা লিখছি না।

১৯৯৪ সালে এসএসসি পরীক্ষার সময় হঠাৎ নোয়াখালী শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রের পরীক্ষার সময়সূচী প্রকাশ করে বিতরণ করা হয়। নোয়াখালী পাবলিক কলেজ নামে বে কয়েকটির ব্যানার লাগানো হয় পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে। তখন ডাঃ এ কে এম আনোয়ার হোসেন (হোমিও) বর্তমানে মরহুম, জেলা অফিসার (অবসরপ্রাপ্ত) আলহাজ্ব মোঃ মাহফুজুর রহমান, ফ্যাসিলিটি ও ডিপার্টমেন্টের সহকারী প্রকৌশলী আলহাজ্ব মোঃ আইন উদ্দিন আহমেদ (বর্তমানে মরহুম) যা দিয়ে তাকে বেশ উৎসাহিত উদ্দীপনা যোগান। অনেকেই কলেজ প্রতিষ্ঠা বা চালু নিয়ে নানা মন্তব্য করেন এবং বিষয়টি অসম্ভব বলে এড়িয়ে যান। নোয়াখালী আইন কলেজ ভবন ব্যবহারের আশায় কলেজের অধ্যক্ষ এডভোকেট আলহাজ্ব ফিরোজ হক চৌধুরী সাহেবকে কলেজের সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক পদে মনোনীত করা হয়। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা বা আইন কলেজ ভবন ব্যবহারে অনিচ্ছা ও অনীহা প্রকাশ করেন। নোয়াখালীর কৃতি সন্তান সাবেক প্রধান বিচারপতি বর্তমানে মরহুম বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত করা হয়। সাবেক মন্ত্রী ও বিশিষ্ট শিল্পপতি মেজর (অব.) আব্দুল মান্নানকে প্রধান পৃষ্ঠপোষক মনোনীত করা হয়। উপদেষ্টা মন্ডলী ও পৃষ্ঠপোষকদের একটি তালিকা ছাপানো হয় এবং কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি হ্যান্ডবিল/প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়। কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও সংবাদ ছাপা হতে থাকে, দৈনিক জাতীয় নিশান পত্রিকার এ ব্যাপারে বেশ ভূমিকা ও অবদান ছিল। অনেকেই ঐ সব প্রকাশিত সংবাদের বিরুপ মন্তব্য ও সমালোচনা করেন। জনাব মোহাম্মদ ফারুক এডভোকেট তখন অধ্যক্ষের সাথে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করেন কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন চট্টগ্রাম বিভাগীয় উপ-পরিচালক জনাব প্রফেসর মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন আমাকে কলেজের প্রথম অনুমোদনের ব্যাপারে বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ও চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে বিশেষ অনুরোধ জানান। তিনি ফেনী জেলার অধিবাসী ছিলেন।

কলেজের মনোনীত পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টাবৃন্দ থেকে তেমন কোন আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। জনাব আশরাফুল করিম এডভোকেট সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগী উদ্দম ও সাহসের মাধ্যমে কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন কিছু লোক উৎসাহ যোগান আবার কিছু লোকের বিরূপ মন্তব্যের শিকার হন। কলেজে চাকুরীর জন্য কয়েকজন শিক্ষক কর্মচারী যোগাযোগ শুরু করেন এবং তাঁর কাছে আসা যাওয়া করতে থাকেন। কিছু মহিলার স্বামী অথবা পিতা তাঁর সাথে চাকুরীর জন্য যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন শুরু করেন। তাঁর কলেজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে যেন বিপাকে পড়েন কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে নোয়াখালী শহরে ভবিষ্যতে তাঁর নেতৃত্বে বা জনসেবা ও সমাজ কল্যাণে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে সে আশাংকায় কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ উদ্যোগ গ্রহণ করেন যাতে সাফল্য লাভ করেন। মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৯৪ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ফল প্রকাশের পর ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ ও কলেজে কার্যক্রম পরিচালনায় জন্য একটি ভবন বা ঘর কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবহারের চিন্তা ও চেষ্টা শুরু হয়। জেলা প্রশাসক বরাবরে সেজন্য একটি দরখাস্ত করা হয় গণপুর্ত বিভাগের একটি পরিত্যক্ত বা অব্যবহৃত ঘরের জন্য। নোয়াখালী আইন কলেজ বা প্রভাতী স্কুল ব্যবহারের অনুমতি চেয়েও পাওয়া যায়নি। হরিনারায়ণপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মরহুম সিদ্দিকুর রহমানকে মর্নিং শিফটে কলেজ চালুর জন্য এবং বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী দ্বারা বিজ্ঞান ভবন নির্মাণের আশ্বাস দিয়ে সেটাও পাওয়া যায়নি।

তখন মাইজদী বাজারের শফিকুর রহমান (মরহুম) সাহেবের সাথে যোগাযোগ হয় তিনি এডভোকেট সারওয়ার ই-দ্বীনকে সাথে নিয়ে জনাব মোঃ আনোয়ার মির্জার সাথে দেখা করার কথা বলেন তৎকালীন জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুর রহমান সাহেবসহ জনাব আনোয়ার মির্জার সাথে মরহুম সফিকুর রহমান ও এডভোকেট সারওয়ারই দ্বীনকে নিয়ে বৈঠক ও উনাকে কলেজ কমিটির সভাপতি করে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। আনোয়ার মির্জা অরুণ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিও মরহুম সফিকুর রহমান সহসভাপতি হিসেবে উক্ত স্কুলে মর্নিং শিপ্টে কলেজ চালুর জন্য আবেদন করার পর স্কুল কমিটির সভায় তা অনুমোদিত হয়নি। এদিকে প্রেসে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি পোষ্টার ও

হ্যান্ডবিল ছাপার অপেক্ষায় এবং ব্যানারে কলেজের অস্থায়ী কার্যালয় লেখার জন্য অপেক্ষায়। তখন এডভোকেট সারওয়ার ই-দ্বীন স্থানীয় এম এ সাত্তার উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সহসভাপতি হিসাবে উক্ত স্কুলে কলেজের অস্থায়ীভাবে কার্যালয় স্থাপন ও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির কার্যক্রম শুরুর ব্যাপারে আশ্বাস দেন ও একটি দরখাস্ত দিলে বিদ্যালয়ের কার্যকরী কমিটিতে তা অনুমোদিত হয়। মাইজদী পাবলিক কলেজের সাইনবোর্ড লাগিয়ে একটি রুমে কলেজের অফিস করে কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু আশানুরূপ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়নি এবং বোর্ড থেকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুমতি পাওয়া যায়নি। ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বাঁধেরহাট আব্দুল মালেক কলেজে ভর্তি করা হয়। কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বন্ধ হয়নি। অতঃপর আবেদনে চেশায়ার ফাউন্ডেশন থেকে বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী সাহেব কিছু আসবাবপত্র প্রদান করেন। তখন মাননীয় বৃটিশ হাই কমিশনারের নোয়াখালি সফর উপলক্ষ্যে স্থানীয় ডানিডা ট্রেনিং সেন্টার মিলনায়তনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কলেজের সৌজন্যে। ব্যক্তিগত তহবিলের খরচ দ্বার কলেজের প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রমের জন্য প্রথম বছর কোন ব্যক্তি বা সংস্থা থেকে কিংবা সরকার থেকে কোন অনুদান গ্রহণ করা হয়নি। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত তহবিল তেকেই সমস্ত ব্যয়ভার বহন এবং চাঁদা গ্রহণের কোন রশিদ বই ছাপা হয়নি। কেই কোন টাকা দেয়ার ইচ্ছাও পোষণ করেননি। কলেজ প্রতিষ্ঠা অনিশ্চিত বলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সকল ব্যয়ভার চালান জনাব আশরাফুল করিম চৌধুরী এবং তিনি অবৈতনিক প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন প্রথম ৩ বছর যাবত।

১৯৯৪ সালে কলেজ চালু করতে বেশ হিমশিম খেতে হয়। বোর্ড থেকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুমতি না পাওয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাশ শুরু করা বা পাঠদান সম্ভব হয়নি। কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম বন্ধ থাকেনি। এডভোকেট মোহাম্মদ ফারুক তার হোন্ডা করে অধ্যক্ষকে বিভিন্নস্থানে যাতায়াতে সহযোগিতা করেন। ডাঃ এ কে এম আনোয়ার হোসেন (মরহুম) এর চেম্বারে নিয়মিত যাতায়ত ও কলেজ প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মূলত সেটাই ছিল ঠিকানা। নামে মাত্র ও সাইন বোর্ড সর্বস্থ কার্যালয় ছিল এম এ ছাত্তার উচ্চ বিদ্যালয়ে, জেলা শিক্ষা অফিস ছিল যোগাযোগের ঠিকানা শিক্ষা অফিসার আলহাজ্ব মোঃ মাহফুজুর রহমানের ভূমিকা ও অবদানের কারণেই ইসলামিয়া রোডসহ ইঞ্জিনিয়ার মাইন উদ্দিনের অফিসও বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

১৯৯৫ সালে স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব আলহাজ্ব মোঃ শাহজাহান সাহেবের সাথে যোগাযোগ হয় এবং কলেজ প্রতিষ্ঠায় তার অবদান ও ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানান হয়। পরে মিসেস শাহজাহানও সাহায্য সহযোগিতা করেন এবং এম পি সাহেবকে পাবলিক কলেজের ব্যাপারে উৎসাহ দেন। তখন জেলা প্রশাসক জনাব মশিউর রহমানও কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহ দেখান। শুরু হয় জোর তৎপরতা। কলেজের জন্য জমি বরাদ্দ এবং কলেজ স্থাপনের জোর প্রচেষ্টা চলে। তখন মেজর মান্নান সাহেব ছিলেন সরকারের প্রতিমন্ত্রী ও নোয়াখালী জেলার দায়িত্বে। তিনিও বিভিন্ন দরখাস্তে মন্ত্রী হিসেবে সুপারিশ করেন এবং এমপি সাহেবেরও সুপারিশ ছিল প্রায় সব দরখাস্তে। স্থানীয় এমপি হিসেবে জনাব মোঃ শাহজাহান ভূমিকা ও অবদান রাখেন। কলেজের স্থান নির্ধারণ বা জমি সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলে। প্রিন্সিপাল আশরাফুর করিম এডভোকেট ১৯৯৪ সালে মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মরহুম সফিকুর রহমান মাইজদী বাজারে সরকারী খাস জমিতে (অরুণ চন্দ্র স্কুলের উত্তর পাশে) দখল বা নোয়াখালী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পুরাতন ভবনের কলেজ স্থাপনের পরামর্শ দেন। কেউ কেউ হরিনারায়নপুর রায় বাহাদুরের জমিতে কলেজ স্থাপনের কথা বলে। নোয়াখালী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শাখা পুরাতন ভবনে স্থানান্তর করার কারণেও মাইজদী বাজারস্থ খাস জমি রাজস্ব বিভাগের অফিস ও ব্যবহারের বাধ্যবাধকাত থাকায় তার জন্য চেষ্টা করা যায়নি। নোয়াখালী জিলা স্কুলের পেছনে সরকারী গণপুর্ত বিভাগের জমিতে কলেজ স্থাপনের কথা উঠে। কিন্তু ঐ জমিতে মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক কলোনী করার উদ্যোগ এবং বিচারকদের আবাসিক ভবন নির্মাণে সরকারী পরিকল্পনা থাকায় সেটাও পাওয়া যায়নি। গণপুর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিসে জমির জন্য আবেদন করা হয়।

নোয়াখালী শহরের উন্নয়নকল্পে নতুন করে মাষ্টার প্ল্যান ও গণপুর্ত বিভাগের জমি ব্যবহারের নক্সা প্রণয়নকল্পে সরেজমিনে গণপুর্ত অধিদপ্তরও যোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ সরেজমিনে মাইজদী শহর পরিদর্শন ও জরীপ করতে আসলে তখন এমপি সাহেব আল-ফারুক একাডেমী সংলগ্ন খালি জমিতে মাইজদী পাবলিক কলেজ স্থাপনের সুপারিশ করেন। স্থানীয় গণপুর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, নোয়াখালী, তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী কুমিল্লা, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী চট্টগ্রাম, প্রধান প্রকৌশলী গণপুর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা এবং স্থাপত্য অধিদপ্তরের, পরিচালক উক্ত জমি মাইজদী পাবলিক কলেজের অনুকূলে বরাদ্দের প্রস্তাবে সুপারিশ করেন। সচিবালয়ে মাননীয় গণপুর্ত মন্ত্রী ও সচিব বরাবরে জমির জন্য আবেদন করা হয়। সে আবেদনে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী (অবঃ) আব্দুল মান্নান এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ শাহজাহানের সুপারিশ ছিল। উক্ত জমি বরাদ্দের চূড়ান্ত অনুমোদন মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে। উক্ত জমিতে কলেজ স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। মাননীয় এমপি সাহেব জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে/মিলনায়তনে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের সাথে এক মত বিনিময় সভার আয়োজনের পরামর্শ দেন। সে মতবিনিময় সভায় কলেজ

প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মাননীয় এমপি ও জেলা প্রশাসক সাহেব একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং আল ফারুক একাডেমী সংলগ্ন জমিতে কলেজ স্থাপনের লক্ষ্যে সব ধরনের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার আহ্বান জানান।

এম এ ছাত্তার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তখন কলেজের অস্থায়ী কার্যালয় স্থানান্তর করে আল ফারুক একাডেমীর পুরাতন ঘরে স্থানান্তর করা হয়। উক্ত ঘরের মালিককে কিছু টাকা দিয়ে নতুন একটা ঘর করে কলেজের অফিস স্থাপন করার ব্যবস্থা হয়। কলেজের জমিতে সাইন বোর্ড লাগানোর লক্ষ্যে ঐ সময় এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। মাননীয় এমপি সাহেব তখন তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এককালীন এক লক্ষ টাকার অনুদান প্রদানের ঘোষণা করেন। কলেজের সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ আনোয়ার মির্জা নগদ দশ হাজার টাকার অনুদান প্রদান করেন। তখন কলেজের নামে একটি ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়।

কলেজের জমিতে সাইনবোর্ড লাগানো উপলক্ষে এক মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বায়তু সাইফ দরবার শরীফের পীর হযরত মাওলানা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব মুনাজাত পরিচালনা করেন। কলেজ স্থাপন ও প্রতিষ্ঠায় তিনি স্থানীয় এমপি ও জেলা প্রশাসক সাহেবকে বিশেষ অনুরোধ জানান। পরবর্তীতে উক্ত স্থানে কলেজ অধ্যক্ষের কার্যালয় ও কলেজের কার্যক্রম চলতে থাকে। উক্ত জমির দখলদার বা সাবেক মালিকানা দাবীদারসহ বিভিন্ন কুচক্রী মহলের শুরু হয় কলেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত। তাদের হাত থেকে অধ্যক্ষ রেহাই পাইনি। মূলত তারা বিরোধিতা করেছিলো কলেজ যেন প্রতিষ্ঠা লাভ না করে। অধ্যক্ষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয়। সে স্থানে কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ শাহজাহান কলেজের জমিতে মাটি ভরাটের জন্য কাবিখা কর্মসূচীর অধীনে ২৫ মে. টন গম বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। শুরু হয় মাটি ভরাটের কাজ। তাতে কিছু বাধা বিপত্তি আসে। গমের কাজেও নানা সমস্যা ও জটিলতা দেখা দেয়। শুরু থেকে অসুস্থ প্রজেক্ট কমিটিতে সদস্য ছিলেন না। সে জন্য পরবর্তীতে গমের বিরুদ্ধে অথবা সেই কাজেই তাকে জড়িত করার সুযোগ ছিলনা। মাটি ভরাটের পর কলেজ গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সেজন্য প্রাপ্ত কোন টাকা পয়সা বা তহবিল ছিলনা। সাহেবের হাটস্থ এক কাঠ মিস্ত্রি বাকীতে উক্ত কলেজ ঘর নির্মাণের প্রস্তাব করেন এবং সে মতে কাজ শুরু হয়। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জনাব আশরাফুল করিম বাকীতে কলেজ ভবন নির্মাণ ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করেন। তাঁর ওকালতি চেম্বারের টেবিল-চেয়ারের ধারা অধ্যক্ষের অফিস চালু করেন।

১৯৯৬ সালের শুরু থেকে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও গন্ডগোল দেখা দেয়। ফলে স্থানীয় সংসদ সদস্য বা মন্ত্রী মহোদয়ের কলেজ নিয়ে কিছু করা বা সময় দেয়া সম্ভব হয়নি। অধ্যক্ষ এককভাবে বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেন তখন জুন মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এসে পড়ে। নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন বা সংসদ সদস্যের পরিবর্তনের আশংকার উক্ত নির্বাচনের দিনই কলেজ গৃহ নির্মাণের অর্থাৎ ঘর তোলার কাজ হয়। ইতিপূর্বে সকল কাঠ তৈরী ও ঘরের ব্যবস্থা করে নির্বাচনের দিনে সারারাত ভর কলেজ ঘর তোলা হয় এতে অনেকেই হঠাৎ কলেজ গৃহ কাঠামো দেখে আশ্চর্যান্বিত হন।

সে অনুমান সত্য হয়। সরকার পরিবর্তন হবার কারণে রাতারাতি কলেজ ঘর তৈরী সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল বলে মনে হয়। নচেৎ রাজনৈতিক কারণে উক্ত স্থানে কলেজ গৃহ নির্মাণ অসম্ভব হতো। এমনকি কলেজ চালু করা হয়তো সম্ভব হতো না। কারণ অধ্যক্ষকে সরকার বিরোধী রাজনীতির সমর্থক মনে করা হতো। যদিও তিনি কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী বা নেতা ছিলেন না। কলেজ প্রতিষ্ঠাও সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনে মন্ত্রী ও এমপি সাহেবের ঘনিষ্ঠ ছিলেন মাত্র। দীর্ঘদিন যাবত কলেজ গৃহের কাঠ রোদে শোকায় ও বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হতে বসেছে। তখন জেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মাহফুজুর রহমান ও ডাঃ একেএম আনোয়ার হোসেন কলেজ কমিটির সভাপতি জনাব আনোয়ার মির্জাকে অনুরোধ করেন বাকীতে কলেজের ছাউনীর জন্য টিন ক্রয় করে দিতে। তিনি কলেজ ঘর দেখে তাতে কাজ হয়নি। জনাব আনোয়ার মির্জা মাইজদী টিনের ব্যবসায়ী মিঃ খোকনকে প্রয়োজনীয় সকল টিন বাকীতে সরবরাহের অনুরোধ করেন। পরে তিনি ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা পরিশোধ করেন, বাকী টাকা পর পরিশোধের ব্যবস্থা হয়। কাঠ মিস্ত্রি মুরশিদ আলম প্রায় লক্ষাধিক টাকার বাকীতে সমস্ত কাঠ সরবরাহ এবং কলেজ ঘর নির্মাণের কাজ করেন। যাতে কলেজ প্রতিষ্ঠায় তার অবদান ও ভূমিকা অনস্বীকার্য। কলেজ ঘর নির্মাণের পর কলেজের অফিস ও অধ্যক্ষের কার্যালয়ে কিছু পাখা উপহার দেন হামদর্দ ওয়াকফ লিঃ এর পক্ষে এরিয়া ম্যানেজার জনাব হাকীম কামাল উদ্দিন। তাছাড়া বায়তুশ সাইফ দরবার শরীফের পীর সাহেব ২টি পাখা প্রদান করেন। কিছু আলমিরা ঘড়ি ও জিনিসপত্র পাওয়া যায়। যাতে তাদের (দাতার) নাম লেখা আছে।

নোয়াখালী পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব রবিউল হোসেন কচি (বর্তমানে মরহুম) প্রায় দশ হাজার টাকা খরচ করে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পোস্টার ও হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে দেন, যাতে সৌজন্যে নোয়াখালী পৌরসভা লেখা ছিল। তাছাড়া কোনরূপ নগদ টাকা পৌরসভা থেকে পাওয়া যায়নি। কলেজের নতুন ঘরে এক ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। এতে মুনাজাত করেন বায়তুশ সাইফ দরবার শরীফের পীর হযরত মাওলানা মোঃ সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী। কলেজ ভবনের ক্লাশ ও কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয়। জমি সংক্রান্ত সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। এতে স্থানীয় কিছু ব্যক্তি ও

সংস্থা বেশ সহযোগিতা করেন। আজ সকলের বা অনেকের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। তাদের অনেকেই জীবিত নেই। মাইজদী শহরে একটি বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠা স্বপ্ন পূরণ হয়।

১৯৯৫ সালে কলেজের একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুমোদন পাওয়া যায়। শুধু বাণিজ্য ও মানবিক শাখায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুমতি পাওয়া যায় যদিও বিজ্ঞান বিভাগের জন্য আবেদন ছিল। কিন্তু নোয়াখালী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বন্ধ না করে বরং বেশী ভর্তি হবে। নতুন কলেজ ভবন স্থাপন ও প্রতিষ্ঠার অনিশ্চয়তায় তেমন বেশী ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া যায়নি। পরে উক্ত কলেজ ভবনে নৈশকালীন সময়ে নোয়াখালী হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের কার্যক্রম চালুর ব্যবস্থা করা হয় এবং কলেজ ভবনকে বহুমুখী ব্যবহারের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। কলেজের জন্য চেশায়ার ফাউন্ডেশন থেকে প্রাপ্ত কিছু আসবাবপত্র দিয়ে কলেজের ক্লাশ শুরু হয়। কলেজের চাকুরীর জন্য শিক্ষক কর্মচারীদের অস্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয়।

১৯৯৬ সালে কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব আনোয়ারুল হককে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। উক্ত বছর কলেজের প্রথম একাডেমীক স্বীকৃতি পাওয়া যায়। চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে ব্যক্তিগত পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল। তিনি নোয়াখালী সরকারী কলেজে কিছুদিন অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। শিক্ষা ভবনের কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী উক্ত কলেজের অনুদোমন ও স্বীকৃতির ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। কুমিল্লা বোর্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা জনাব এম বি মাহফুজ, দৈনিক জাতীয় নিশান সম্পাদক কাজী মোঃ রফিক উল্যাহ সাহেব, তৎকালীন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব প্রফেসর আবদুল মাজীদের সাথে সাক্ষাত করেন ও কলেজের অনুমোদনের বিষয়ে অনুরোধ করেন। এছাড়া শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমানের ভূমিকা ও অবদান বেশ ছিল। তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

১৯৯৭ সালে বিশিষ্ট শিল্পপতি চট্টগ্রামস্থ এম এম মটরস এর মালিক জনাব মোঃ আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলামকে অনুরোধ জানালে তিনি কলেজের জন্য আরেকটি ঘর নির্মাণে বিভিন্ন কিস্তিতে এক লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান করেন। কলেজের নতুন আরেকটি গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু সে ঘরের কাজ সম্পন্ন করা যায়নি প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাবে। জনাব আশরাফের ব্যক্তিগত ওকালতির জন্য নির্মিত চেয়ার ও টেবিল দ্বারা প্রথমে কলেজের অধ্যক্ষের অফিসে কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত চেয়ার টেবিল এখনও কলেজ অফিসে ব্যবহৃত হচ্ছে। কলেজের শিক্ষক কর্মচারী পদে নিয়োগ লাভের জন্য বিভিন্ন আবেদন নিবেদন ও তদ্বীরা চলে। অধ্যক্ষ ব্যক্তিগতভাবে কিছু অস্থায়ী নিয়োগ প্রদান করেন। তাঁর দ্বারা নিয়োগকৃত বা তাঁর হাতে পায়ে ধরে চাকুরী লাভকারী শিক্ষক কর্মচারীরা পরবর্তীতে মীরজাফরের ভূমিকায় তাঁর বিরোধিতা করেছে। যেটা দেখে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ বিস্মিত হন এবং হতাশ হয়ে পড়েন। কলেজের প্রথম সাংগঠনিক কমিটির সদস্য হিসেবে এডভোকেট এ বি এম জাকারিয়া, অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় সরকার, প্রধান শিক্ষক জনাব সিদ্দিকুর রহমান, মিলন রেডিও সার্ভিসের জনাব (মরহুম) গোলাম মোস্তফা তৎকালীন পৌর কমিশনার অহিদ উদ্দিন মুকুলসহ অনেকেই নিঃস্বার্থভাবে কলেজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা ও অবদান রাখেন এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেন। জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণসহ শিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেছেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার পরপরই কলেজের প্রতি অনেক রাজনৈতিক নেতা বিশিষ্ট ব্যক্তির চোখ পড়ে। কেউ কেউ কলেজের দাতা বা কমিটির সদস্য হবার আগ্রহ প্রকাশ শুরু করেন। আবার কিছু কিছু লোক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত শুরু করে কেউ কেউ কলেজ কমিটির সদস্য বা সভাপতি কাজ দখল আবার কেউ কেউ দলটি পোষক নিয়োগের কথা বলেন।

১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত প্রায় ৩ বছর যাবত মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়। ১৯৯৭ সনে জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মাইজদী পাবলিক কলেজের অবয়ব ও বাস্তবতা চোখে পড়ে। এর আগে কেউ বিশ্বাসই করতো না যে এরকম একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। প্রথম দিকে জেলা প্রশাসক সাহেব তো কোন সহযোগিতা করেননি বা সাড়া দেননি। অধ্যক্ষ আশরাফুল করিম অনড় ও সিরিয়াসনেস দেখে শেষ পর্যন্ত অনেকেই কলেজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন বা সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। নোয়াখালী জেলার তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় থেকে প্রত্যক্ষ কোন সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। যে রকম স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। সেজন্য তিনি ধন্যবাদ প্রাপ্য। পরবর্তীতে তিনি কলেজের সভাপতি হন। জনাব আশরাফ যৌবনের মূল্যবান সময়ে মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। মাইজদী শহরে ওকালতি করার জন্য চরবাটা সৈকত কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু তখন ওকালতি শুরু না করে তথা কোর্ট কাচারীতে উকিল হিসেবে না গিয়ে কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। নোয়াখালী বার লাইব্রেরীতে গেলে সকলেই প্রিন্সিপাল বলে সম্বোধন করতেন। উকিল সাব বা এডভোকেট বলে কেউ ডাকতেন না । তাঁর কলেজ প্রতিষ্ঠায় অবদান ও ভূমিকা তখনকার কারো পক্ষে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। যদি এরকম কেউ করে থাকেন তবে তা রাজনৈতিক বা কোন

ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে। তাছাড়া ১০/১২ বছর পর এখন অনেকের স্মৃতিভ্রম হতে পারে অথবা অনেক কিছু স্মরণ নাও থাকতে পারে। কলেজটির একক প্রতিষ্ঠাতা জনাব আশরাফুল করিম।

ব্যক্তিজীবনে সাংবাদিকতা করা এবং সাপ্তাহিক নোয়াখালী বার্তা ও মাসিক নোয়াখালী দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক থাকার সুবাধে অনেক স্থানীয় পত্রিকা ও সাংবাদিক মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় প্রেস বিজ্ঞপ্তি, সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে বেশ সহযোগিতা করেছেন। তাদের ভূমিকাও বেশ প্রশংসনীয়। এরকম সংবাদ ছাপানোর জন্য জাতীয় নিশান পত্রিকাকে বিরূপ মন্তব্য ও কটাক্ষ শুনতে হয়। কলেজের প্রতিবেদনে তাঁর ছবি প্রকাশিত হয়েছিলো। সেসব নিয়েও অনেক কথা উঠেছিলো। তাঁকে অনেকেই সহ্য করতে পারেননি। তবুও কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগ ও উদ্দমের কমতি ঘটেনি বা বন্ধ হয়নি।

আর্থিকভাবে তিনি স্বচ্ছল ছিলেন না, কিন্তু ব্যক্তিগত সামান্য আয় রোজগার ছিল। তাঁর আয়ের প্রায় সব টাকাই মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করেন টাকা-পয়সার চেয়েও তাঁর সারাক্ষণ কলেজ নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও কলেজে অবস্থান করা চিল একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। তাঁর বাসা ও কলেজের অধ্যক্ষের কার্যালয় বলে পৃথক কিছু ছিল না এক রুমে তিনি থাকতেন, আর এক রুমে কলেজের অফিস ছিল। আল ফারুক একাডেমীর পুরাতন ঘরে।

জনাব আশরাফের নামের সাথে পাবলিক কলেজের নামের একাত্মতার সৃষ্টি হয়। পাবলিক কলেজ মানেই তাঁর নাম বা তাঁর না মানেই পাবলিক কলেজ ছিল। অবশ্য এক বছর তো বেশ কৌতুহল ও প্রশ্নবোধক ঘটনা ঘটেছে। পাবলিক কলেজ আদৌ হবে কিনা বা শেষ পর্যন্ত পাবলিক কলেজ করতে পারবো কিনা তা নিয়ে বেশ সন্দেহ ও সমালোচনা ছিল। কলেজের ছাত্র সংখ্যা কলেজ ভবন ও পাঠদান নিয়ে নানা প্রশ্ন ছিল। তবে শিক্ষক কর্মচারীর অভাব ছিলনা। অনেকে নামের আগে অধ্যাপক পদবী লেখার বা ব্যবহারের সুযোগ লাভ করেন। নিয়োগ লাভের কারণে। অধ্যাপক মাইন উদ্দিন মঞ্জু (খলিল মিয়ার ভাতিজা) কলেজের প্রয়োজনে পনর হাজার টাকা দেন, সেটা যদিও ঋণ বলে দিয়েছেন তবে ফেরত নেননি। এভাবে কেউ কেউ কলেজে ঋণ দিয়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা ভবন ও শিক্ষা বোর্ডসহ শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন অফিসও দপ্তরে অধ্যক্ষের যাতায়াত ছিল বেশী। কয়েক হাজার শিক্ষকের ব্যক্তিগতভাবে তিনি উপকার করেছেন। ১৯৮২ সনের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরীপে (স্কুল), কলেজ ও মাদ্রাসা, দায়িত্ব পালন থেকেই মূলত তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা বিভাগের প্রতি দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত অল্প বয়সেই বিনা অভিজ্ঞতায় তথা অধ্যাপনা ছাড়াই প্রিন্সিপাল হওয়া। মাইজদী পাবলিক কলেজের শুরুতে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করার জন্য কাউকে পাওয়া যায়নি, তাছাড়া অবৈতনিকভাবে দায়িত্ব পালন কিংবা অস্তিত্বহীন কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণে কেউ রাজী ছিলেন না। অবশেষে তাঁকেই প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করতে হয়। অবশ্য কলেজের প্রতিষ্ঠা লাভের পর অনেকেই অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভ বা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এমনকি জেলা প্রশাসক, এমপি সাহেব কিংবা কলেজের পরিচালনা পরিষদে তদরীর শুরু করেন। হায়রে কপাল বা নিয়তি। প্রথম তিন বছর কলেজের জন্য চাঁদা তোলা বা অনুদান গ্রহণে রাজী ছিলেন না। যা খরচ করেছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে বা টাকা গ্রহণের মাধ্যমে। কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের আপ্যায়নে স্থানীয় ইসলামিয়া রোডের পারভিন হোটেলের (মালিক) মমিন মিয়া বাকীতে খাবার সরবরাহের কথা উল্লেখ করতে হয়। জেলা প্রশাসকরে কার্যালয় ও গণপুর্ত বিভাগে বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে বেশ সহযোগিতা করেছেন, আজ অনেকেরই নাম মনে পড়ছে না। তবে তারা ধন্যবাদ প্রাপ্য। অনেকেই ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও পরিচিতির কারণে কলেজ প্রতিষ্ঠার অনেক সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। এমন কেউ যদি আজ তার কথা স্বীকার করতে বলেন, সেটা স্বীকার করতে হবে।

মরহুম বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী সাহেব দ্বারা কলেজ প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপক উন্নতির স্বপ্ন ছিল। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি ইচ্ছা থাকা সত্বেও সহযোগিতা করতে পারেননি। তার মাধ্যমেই তৎকালীন বৃটিশ হাই কমিশনারের নোয়াখালী সফরের সময় স্থানীয় ডানিডা ট্রেনিং সেন্টার মিলনায়তনে তার সম্মানে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কিন্তু তার কাছ থেকেও কলেজ উন্নয়নে কোন ভূমিকা বা অবদান লাভ করেনি। বিশেষ কারণে মাইজদি পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে এবং প্রতিষ্ঠার পর কুচক্রী মহল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত পরবর্তী লেখায় প্রকাশ করবো বলে এখানে তা উল্লেখ করলাম না। পাঠকদেরকে সেজন্য অপেক্ষার অনুরোধ করছি। এ লেখাটা অসম্পূর্ণ। যদি কারও কোন ভূমিকা বা অবদানের কথা এ লেখায় উল্লেখ না করি কিংবা কেউ যদি মনে কষ্ট পান তাহলে মাফ চেয়ে নিচ্ছি। সেজন্য তা স্মরণ করিয়ে দিলে বা জানালে কৃতার্থ হবো এবং তা পরবর্তীতে যে কোন লেখায় স্মরণ করবো বা প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিলাম। লেখার শুরুতে বলেছিলাম কলেজ প্রতিষ্ঠায় শিক্ষক ও কর্মচারীদের কিছু ভূমিকা ও অবদানের কথা উল্লেখ না করার কারণ হলো কলেজের কারণে তারা চাকুরী লাভ করেছেন এবং বিনিফিশিয়ারী। তাছাড়া কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে শিক্ষক কর্মচারী মীরজাফরের মত বেঈমানী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সে

কারণে তাঁর লেখায় তাদের কথা তেমন কিছু না আসটাই স্বাভাবিক। শিক্ষক কর্মচারীদের গ্যারিং ও দলাদলি এখনও লক্ষ্য করার মত। অথচ কলেজের কোন উন্নতি ও উন্নয়ন হয়নি।
প্রিন্সিপাল আশরাফুল করিম এডভোকেট মাইজদী পাবলিক কলেজের একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা।
//////////////////////////

মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রতিষ্ঠার ১৮ বছরেও তেমন কোন উন্নয়ন ও উন্নতি হয়নি, তবে প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত হয়েছে

নোয়াখালী জেলা শহরে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর ১৮ বছরেও মাইজদী পাবলিক কলেজের উন্নয়ন ও উন্নতি হয়নি এবং তার ফলে কলেজের মান উন্নয়ন ও আশানুরূপ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়নি এবং কলেজটি ভালভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি, তবে প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত হয়েছে।

নোয়াখালী জেলার প্রধান শহর মাইজদী কোর্টে কোনো বেসরকারি কলেজ না থাকায় বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী প্রিন্সিপাল আশরাফুল করিম এডভোকেট মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কলেজটি স্বীকৃতি লাভের পর ১৯৯৮ সালে এমপিও ভুক্তির সময় কতিপয় কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের কলেজ থেকে অপসারণের হীন প্রচেষ্টায় উক্ত কলেজের উন্নয়ন ও উন্নতি বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে কলেজের শিক্ষক কর্মাচারীদের বেতন ও সরকারী এমপিওর উত্তোলন ছাড়া কলেজের ভবন ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। ফলে শ্রেণী কক্ষে পাঠদানসহ বিভিন্ন সমস্যায় কলেজটি বর্তমানে জর্জরিত। কলেজ ছাত্র ছাত্রীদের কমনরুম ও আভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সামগ্রী নেই। খেলার মাঠের অভাবে বহিঃক্রীড়ার ব্যবস্থা নেই। সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রতিযোগিতার অভাব রয়েছে এমন কি কলেজের কোনো বার্ষিকী বা স্মরণিকা প্রকাশিত হয়নি। মোট কথা কলেজ আশানুরূপ অগ্রগতি ও কার্যক্রম নেই বললেই চলে।

কলেজটিতে দীর্ঘদিন যাবত কোনো স্থায়ী অধ্যক্ষ নেই। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের অবৈধ ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাময়িক বরখাস্তের বিরুদ্ধে আদালতে দীর্ঘদিন মামলা ছিল। পরবর্তীতে সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আতাউর রহমান কয়েক বছর অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে একজন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আছেন। মাইজদী পাবলিক কলেজের বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে বাণিজ্য ও মানবিক শাখায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও পাঠদান করা হয়। অথচ সংস্কৃতির বার বছর পরও ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করাতো দূরের কথা উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ চালুর ব্যবস্থা করা হয়নি। যা জেলা শহরের জন্য খুবই জরুরি দরকার। মাইজদী পাবলিক কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি হিসাবে পদাধিকার বলে স্থানীয় প্রাক্তন সাংসদ জনাব মোঃ শাহজাহান দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে সভাপতি হিসাবে নোয়াখালী সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদাধিকার বলে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি হিসেবে অধ্যক্ষ বেলাল উদ্দিন কিরণ কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি। কলেজটি উন্নয়নের জন্য সরকারি উদ্যোগ কোনো ভবন নির্মাণ করা হয়নি। তবে জেলা পরিষদ একটি ক্লাশরুম নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করেছে এবং দাতা হিসাবে আলহাজ্ব মো. সিরাজুল ইসলাম কলেজের একটি ঘর ও সীমানা দেওয়াল নির্মাণের ব্যবস্থা করেন বলে জানা গেছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরুতে যারা কলেজ বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন তাদেরকে পরবর্তীতে ডাকা হয়নি বা মূল্যায়ন করা হয়নি। কিন্তু কোনোরূপ অবদান ও অনুদান ছাড়াও পরবর্তীতে কিছু লোককে কলেজ কমিটির সদস্য করা হয়েছে। কলেজটি জেলার বিশিষ্ট শিল্পপতি ও দানশীল ব্যক্তিবর্গের সুদৃষ্টি কাটতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ কলেজের প্রতিষ্ঠাতার ন্যূনতম মূল্যায়ন হয়নি। প্রতিষ্ঠাতার প্রতি অবিচার ও অবমূল্যায়ন করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠাতাকে কলেজ থেকে দূরে রাখার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত

মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, সাংবাদিক ও লেখক প্রিন্সিপাল আশরাফুল করিম এডভোকেট বর্তমানে সাউথ আফ্রিকায় প্রবাসী ও প্রতিষ্ঠিত। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কলেজের উন্নতি ও উন্নয়ন না দেখে দীর্ঘ ১৫ বছর পর তিনি দেশে এসে হতবাক ও বিস্মিত হয়েছেন। অথচ কলেজের গভর্নিং বডিতে অনেক ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি সদস্যপদ লাভসহ শিক্ষক কর্মচারীরা সরকারি বেতন ভাতা ভোগ করলেও কলেজটি উন্নয়ন ও উন্নতির জন্য তেমন জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়নি বা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি দেখে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। জনাব আশরাফের স্বপ্ন ও সম্ভাবনা ছিল মাইজদী পাবলিক কলেজকে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নত করা। কিন্তু কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্তে সেটা করতে পারেননি বলে জানান। জনাব আশরাফ চরবাটা সৈকত কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ, মেজর মান্নান ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক নোয়াখালী বার্তা ও মাসিক নোয়াখালী দর্পণ পত্রিকার

সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। বর্তমানে জনাব আশরাফ সাউথ আফ্রিকায় বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত এবং ইউনিভার্সিটি অব বোতসোয়ানা থেকে এমএড ডিগ্রী কোর্স সম্পন্ন করেছেন। তিনি সাউথ আফ্রিকা থেকে বাংলায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকার মাসিক বাংলাদেশ পোষ্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, ঢাকা থেকে ইংরেজীতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ঢাকা পোস্ট এবং লন্ডন থেকে বাংলায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট পত্রিকার প্রতিনিধি। তিনি প্রবাসে থেকেও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখালেখিসহ দেশের বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত আছেন।
//////////////////////

প্রিন্সিপাল আশরাফুল করিম এডভোকেট-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জনাব মুহাম্মদ আশরাফুল করিম ১৯৬৫ সালে নোয়াখালী সদরের ৮ নং এওজবালীয়া ইউনিয়নের পশ্চিম করিমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মরহুম পিতা একবার ইউনিয়ন কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্রজীবনে আশরাফ মেধাবী ও কৃতি ছাত্র হিসেবে আজীবন বৃত্তিধারী ছিলেন। তিনি নোয়াখালী জিলা স্কুল থেকে ১৯৮০ সালে এসএসসি পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগে মেধা তালিকায় কুমিল্লা বোর্ডের ১১ তম স্থান এবং চট্টগ্রাম গভমেন্ট কমার্স কলেজ থেকে ১৯৮২ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগের মেধা তালিকায় ২য় স্থান লাভ করেন।

জনাব আশরাফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগ থেকে বি.কম (অনার্স) ও এম.কম ডিগ্রী লাভ করেন এবং এমফিল কোর্সে ভর্তি হন। কিন্তু তা সম্পন্ন করতে পারেননি। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি সিএ কোর্স সম্পন্ন করেন। সম্প্রতি তিনি আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত বোতসোয়ানা ইউনিভার্সিটিতে এম.এড কোর্স সম্পন্ন করেন।

ছাত্রজীবন থেকে লেখালেখি ও সাংবাদিকতার সাথে জনাব আশরাফ সম্পৃক্ত ছিলেন। চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ হোস্টেলের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন। তিনি রচনা লিখেন, বক্তৃতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অসংখ্য পুরস্কার লাভ করেন। বিভিন্ন সময়ে দেয়ালিকা, কবিতাপত্র, সাহিত্য সাময়িকী সম্পাদনা ও প্রকাশনা করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের ভর্তি সহায়িকা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য নোট বই সম্পাদনা ও প্রকাশনা করেন। দেশে সাংবাদিক হিসেবে তিনি বেশ পরিচিতি লাভ করেছেন। লেখক ও সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর যশ ও খ্যাতি ছিল।

জনাব আশরাফ অধুনালুপ্ত মাসিক নোয়াখালী দর্পণ নামক ম্যাগাজিন ও সাপ্তাহিক নোয়াখালী বার্তা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি করেন। তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিথ সাপ্তাহিক ঢাকা পোস্ট এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলা পোস্টের আফ্রিকা প্রতিনিধি হিসেবে লেখালেখি করেন। বর্তমানে তিনি সাউথ আফ্রিকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা পত্রিকা 'মাসিক বাংলাদেশ পোষ্ট' এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

জনাব আশরাফ চরবাটা সৈকত কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ, মেজর মান্নান ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিম করিমপুর জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, জমিদার হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি (১৯৯৫-৯৭), থানার হাট দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষানুরাগী সদস্য, চর ক্লার্ক বাংলাবাজারস্থ লর্ড লিওনার্ডো চেশায়ার হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বাস্তবায়ন পরিষদের সদস্য সচিব, নোয়াখালী বিভাগ বাস্ত বায়ন পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক, ঢাকাস্থ নোয়াখালী জেলা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ঢাকাস্থ বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, সুধারাম উপজেলা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ঢাকাস্থ নোয়াখালী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং প্রবাসেও শিক্ষা এবং সমাজসেবায় বেশ সক্রিয় আছেন।

জনাব আশরাফ ঢাকা আইনজীবি সমিতির আজীবন সদস্য ও নোয়াখালী জেলা আইনজীবি সমিতির সদস্য, ঢাকা ট্যাক্সেস বার এসোসিয়েশনের লাইফ মেম্বার ও নোয়াখালী ট্যাক্সেস বার এসোসিয়েশনের সদস্য, বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন লইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য, ঢাকাস্থ বৃহত্তর নোয়াখালী আইনজীবি সমিতি এবং বাংলাদেশ আইন উন্নয়ন সংস্থার ডোনার। তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য, ঢাকা ইউনিভার্সিটি রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটস এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির আজীবন সদস্য, নোয়াখালী পাবলিক লাইব্রেরীর আজীবন সদস্য, লক্ষ্মীপুর বার্তা ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষক সদস্য, ঢাকা বোতসোয়ানা কনফেডারেশন অব কমার্স, ইন্ডষ্ট্রিজ এন্ড ম্যানপাওয়া (বকিম), গ্যাবরণী বিজনেস কাউন্সিল, বোতসোয়ানা বিজনেস কনসালটেন্ট এসোসিয়েশন, বোতসোয়ানা এডাল্ট এডুকেশন সোসাইটি এবং ফরেস্টি এসোসিয়েশন অব

বেতাসোয়ানাসহ বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সদস্য এবং বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জনকল্যাণ ও সমাজসেবায় জড়িত। তিনি আর্তমানবতার সেবায় বাংলাদেশে ১০ বার এবং বোতসোয়ানায় ১০ বার রক্তদান করেছেন।

জনাব আশরফুল করিম মাইজদী পাবলিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং অবৈতনিক প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি আফ্রিকা মহাদেশের বেতাসোয়ানায় সস্ত্রীক গমন করেন এবং সেখানে লেখাপড়া ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে তিনি সাউথ আফ্রিকায় প্রবাসী। তিনি ভারত, নেপাল, দুবাই, সাউথ আফ্রিকা, নামিবিয়া, কাতার, লিসুথো, জিম্বাবুই, জাম্বিয়া, সোয়াজিল্যান্ড, মোজাম্বিক, আবুধাবী, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব এবং যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশ সফর করেন তিনি দু'বার পবিত্র ওমরা সম্পন্ন করেছেন। জনাব আশরাফ ২০০৮ সালে ইন্টারন্যাশনাল ডায়লগ এন্ড ফাউন্ডেশন (ইডাব) কর্তৃক জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত গুণীজন সম্বর্ধনা সভায় শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য স্বর্ণপদক এবং একই সাথে এশিয়ান জার্নালিষ্ট সেরিটেবল সোসাইটি কর্তৃক ঢাকায় গ্র্যান্ড আজাদ হোটেলে অনুষ্ঠিত গুণীজন সম্মমনা অনুষ্ঠানে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন। ২০১২ সালে জনাব আশরাফ শিক্ষা ও সমাজসেবায় অবদানের জন্য বাংলাদেশ ঝংকার শিল্পীগোষ্ঠির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পদক লাভ করেন।

তাঁর সাথে যোগাযোগের ঠিকানা : M.A Karim, P.O Box 2002, Mafikeng 2745, South Africa, Mobile :0027 737847020, Tel : 0027 18381 1815 (Home), Fax : 0027 183815294, E-mail : ashraful3@hotmail.com/kari-mashaful@yahoo.com/ ashraf1965@gmail.com.

////////////////////

মাইজদী পাবলিক কলেজের পৃষ্ঠপোষক দানবীর শিল্পপতি আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলামের ভূমিকা ও অবদান

আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পপতি এবং নোয়াখালী জেলার মাইজদী শহরের একটি প্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘ সময়ের অবিরত পরিশ্রমের মাধ্যমেই তিনি আজ বাংলাদেশের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব ও বর্তমানে বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক। সুন্দর মন, সদালাপী মানব কল্যাণে নিবেদিত এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একটি মননশীল মন তার দেহে বসবাস করছে। তিনি মাইজদী পাবলিক কলেজের উন্নয়নে তথা ভবন নির্মাণের জন্য ১৯৯৬ সালে এক লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান করেন। পরবর্তীতে কলেজ উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে কলেজের সীমানা দেয়াল নির্মাণে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। মাইজদী পাবলিক কলেজের উন্নয়নে তার ব্যক্তিগত ভূমিকা ও অবদান বেশ প্রশংসার দাবীদার এবং অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

শোক সংবাদ

মাইজদী পাবলিক কলেজের বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব আলহাজ্ব মাইনুদ্দিন আহমেদ ইঞ্জিনিয়ার এবং ডাক্তার এ কে এম আনোয়ার হোসেনসহ ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মোঃ নূরুল আমিন এবং কলেজের অফিস ম্যাচেঞ্জার মো: আবু তাহের ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন)। তাদের মৃত্যুতে মাইজদী পাবলিক কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ করা হয় এবং তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

মাইজদী পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাদের অবদান ও ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরুতে মরহুম ইঞ্জিনিয়ার মাইনুদ্দিন আহমেদ এবং মরহুম ডাক্তার এ কে এম আনোয়ার হোসেন বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রাখেন।